# পরিক্রমা

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা : আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্‌ পাবলিশার্স ।

প্রথম সংস্করণ
দোলপূর্ণিমা
১৩৬২

প্রকাশক
শ্রীরণজিৎ সেন
আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্ পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅমূল্য দাস

মুদ্রক
ধন্বন্তরি প্রেস লিমিটেড
৫৫ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা ৯

# গৌরচন্দ্রিকা

"ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত।..."

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই কথার পরে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার জন্যে কলম ধরি এ দুর্বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, 'লেখো। লিখে ফেল'। রমণীহৃদয়ে কপটতা আর ইলিশমাছে কাঁটার মতো বন্ধুদের ভালবাসাতেও অত্যাচারথাকে। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। তাই তাঁদের আদেশ শিরোধার্য ক'রে লেখা আরম্ভ করি। সে লেখা "পথে ও পথের প্রান্তে" নামে কিছুকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিল—শ্রীযুত সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্'এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত রণজিৎ সেন মহাশয় সাহিত্য-রসিক। তিনি যখন সেই রচনাটি বর্ধিত কলেবরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার বাসনা জানালেন তখন সত্যই বিস্মিত হ'লাম। একজন অখ্যাত লেখকের বই প্রকাশ করা দুঃসাহস বৈকি!

বইটির ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য আমি পূর্বসূরিগণের বহু প্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর ক'রেছি। এখানে একত্রে তাঁদের

সকলের কাছেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার ঋণ স্বীকার ক'রছি।

আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্'এর পক্ষে শ্রীযুত সত্যেন দত্ত মহাশয় এবং ধন্বন্তরি প্রেসের কর্মীগণ বইখানি অল্পসময়ের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেছেন।

অজ্ঞতা ও অনবধানতার জন্য কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা মার্জনা ক'রবেন এই আমার প্রার্থনা।

৩।১ বাবুতলা রোড, বিনীত

কোলকাতা—২৮ গ্রন্থকার

২৬শে মার্চ, ১৯৫৬

# পরিক্রমা

এই লেখকের লেখা—

মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য

( দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত )

বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। বঙ্কিম তটরেখা। ধূমায়মান অর্ণবপোত। দিক্‌চক্রে কপিশ শৈলমালা।

ছোট্ট দ্বীপ।

কিন্তু রূপের আর অন্ত নেই।

যেমন সুবেশ নরনারী, তেমনি মরসুমী ফুলের বাহার।

হরেক রকম মানুষ। হরেক রকম ফুল।

সমৃদ্ধ মহানগরী।

শ্রেষ্ঠ বন্দর।

প্রাচ্যে সাংহাই'এর পরেই এর স্থান।

Urbs prima in Indis.

কে বলবে আরব সাগরের তীরে এই মহানগরী একদিন ছিল শুধু একটা জলাভূমি। বাদা। কৃষ্ণকায় কোলিদের বাসভূমি ছিল এটা। তারা মাছ ধরত, তাড়ি নামাত ও নারকেল সংগ্রহ করত। এই ছিল তাদের জীবিকা। অবসর সময়ে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে সমুদ্র-দেবতা আর দেবী মুম্বাবাঈ'এর পূজো করত। সমুদ্রকে ভেট দিত নারকেল, দেবীর উপচার সাজাত নানা রকম মাছ দিয়ে। গভীর রাত্রে কখনও দিত নরবলি।

জায়গাটির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে কোন সভ্য মানুষ এর ত্রিসীমায় ঘেঁষত না।

এমনি কেটে গেছে কতকাল। কত দীর্ঘকাল।

হঠাৎ একদিন এখানে হানা দিল কতকগুলো সাদা মানুষ। পর্তুগীজ বোম্বেটের দল। জনপদ লুণ্ঠন করে, নারীকে অপমানিত করে, নিষ্পাপ শিশুকে নিহত করে তারা করল ধর্মপ্রচার। পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠা ক'রল মেরীমাতার মন্দির। মাউণ্ট মেরী।

আলবুকার্ক গোয়া দখল ক'রেছিলেন ক'বছর আগেই। এখন গুজরাতের সুলতানের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিলেন এই দ্বীপটি।

সে আজ চারশ' বছর আগেকার কথা।

কোলি জেলেদের দেবী মহা অম্বা মুম্বাবাঈ'এর নাম থেকে দ্বীপটির নাম হ'ল মুম্বই। তা থেকে বোম্বাই।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্তুগীজরা এই দ্বীপটি উপহার দেয় ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চর্লস্‌কে। পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিণ অব ব্রাগানজার সঙ্গে তাঁর বিয়ের যৌতুকের অংশ হ'ল এই দ্বীপটি।

দ্বিতীয় চর্লস্‌ ছিলেন ফুর্তিবাজ লোক। শিকার, টেনিস আর রেস নিয়ে তাঁর কাটত। তিনিই ইংলণ্ডে ঘোড়ার রেস খেলা প্রবর্তন ক'রে, তাঁর প্রিয় ঘোড়ার নামে, Old Rowley উপনাম লাভ ক'রেছিলেন।

চর্লস্‌'এর বাজারে কিছু দেনা হ'য়ে গিয়েছিল। নগদ টাকা দরকার। সে জন্যে তিনি তাঁর অধীনের ডান্‌কার্ক দুর্গটি যেমন

বিক্রি ক'রে দেন তেমনি এই দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাৎসরিক মাত্র দশ পাউণ্ড খাজনায় ইজারা দিয়ে দেন। সে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন কিন্তু এই জায়গাটি ছিল সাতটি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোনা জল এসে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। আর ভাটার সময় সাতটি দ্বীপ সাত ভাই চম্পার মতো হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়াত। সমুদ্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদটাকেই কায়েম ক'রেছে। বোম্বাই বেসিন সল্‌সেট এলিফ্যাণ্টা সব এখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই।

বোম্বাইকে আধুনিক বসন-ভূষণে সাজিয়ে তোলার প্রথম গৌরব প্রাপ্য জারাল্‌ড আন্‌জীরের। তিনিই এখানে নগর পত্তন করার স্বপ্ন দেখেন। সে স্বপ্ন সত্য হ'য়েছে বহু জনের সাধনায়। বাস্তব আজ ছাড়িয়ে গেছে আন্‌জীরের কল্পনাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ হ'য়েছে এই দ্বীপ।

## ॥ দুই ॥

বোম্বাই'এর শীত থুথ্‌ুড়ে বুড়োর মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে না। জোয়ান ছোকরা। চট্‌পট্‌ আসে যায়। যেন দু'দিনের অতিথি। দূরে কোথাও যাবার পথে ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য থামে এই সমুদ্র আর পাহাড়ে ঘেরা কর্মচঞ্চল ধন-কুবেরের দেশে। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, বোঝা কাঁধে ফেলে, আবার পাড়ি জমায়। অতিথিকে অভ্যর্থনা করার উপযুক্ত সাজ-পোষাক শেষ হবার আগেই সে বিদায় নেয়। বর্ষাবধূর মতো ঘ্যান ঘ্যান ক'রে দিবারাত্র চোখের জল ফেলে যাবার দিন ক্রমেই পিছিয়ে দিতে থাকে না। বধূ শুধু নিজেই কাঁদে না, সবাইকে কাঁদিয়ে ছাড়ে।

শীতের সুরুতে জিমখানাগুলোর ঝিম্ কেটে যায়। বোতল, ব্রিজ, ব্যাডমিণ্টনের ফাঁকে নিত্য জোর আলোচনা চলে। আলোচনার বিষয় নির্দিষ্ট। কুল্লে পাঁচটি। ও. জি. এল্, ইন্‌কম ট্যাক্স, আসন্ন প্রহিবিসন্, রেসকোর্সের তুরঙ্গমী আর রূপালী পর্দার রোহিণী-কৃত্তিকা-ভরণী।

মহালছমী, মালাবার হিল্, মেরিণ ড্রাইভ আর জুহুতে মণ্টিকার্লোর ছোঁয়াচ লাগে। 'বুদ্বুদ সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়'।

আড্ডাগুলো সরগরম হ'য়ে ওঠে শিবাজী পার্কের বেঞ্চিতে আর চৌপাটির শুভ্র বেলাভূমিতে। মারাঠা গুজরাতী মেয়েদের খোঁপায় সাদাফুলের সৌরভ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কোলাবা পয়েণ্ট থেকে মালাবার পাহাড়ের কোল পর্যন্ত আলোর মালা রানীর কণ্ঠের রত্নহারের মতোই ঝলমল্ ক'রে। সার্থক নাম Queen's neck-lace !

কুনো বলে যারা কোথাও কল্‌কে পায় না তারা ঘরেই আসর পাতে। আমাদের আড্ডাও বসতো ঘরেব মধ্যে। ঘরনীরাও যোগ দিতেন।

"সাম্‌নে দিন কয়েক ছুটি র'য়েছে, চলুন অজন্তা-ইলোরা ঘুরে আসি।"

আড্ডার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন 'মোমসাহেব দি কেভ ম্যান।'

মোমসাহেবকে শুভ্রকান্তি মোমের পুতুল মনে করলে ভুল করা হবে এবং তিনি ঠিক গুহাবাসীও নন্। যদিও অকৃতদার এই ভদ্রলোকের পর্বতগুহাবাসী হ'তে বাধা বিশেষ ছিল না। বর্ণে ঘনশ্যাম, আকৃতিতে লোহার কার্তিক, প্রকৃতিতে সদাশিব। প্রাণখোলা হাসি লেগেই আছে। তাঁর মজুমদার উপাধি অগুনতি বন্ধু-বান্ধবের মুখে মোলায়েম হ'তে হ'তে শব্দতত্ত্বের কোন অভিনব মারপ্যাচে পরিণত হ'য়েছিল 'মোমসাহেব'এ। আর তাঁর অনন্যসাধারণ গুহা-প্রীতির জন্য তিনি 'দি কেভ ম্যান' বলে পরিচিত ছিলেন বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী মহলে। পুরো নাম শ্রীবিমল

মজুমদার। বাঙ্‌লা দেশের এক খানদানী ঘরের ছেলে তিনি।

প্রায় বছর খানেক হ'ল বদলী হ'য়ে এসেছি এখানে। এসে থেকে যে কোন ছুটির দিনে, মোমসাহেবের উৎসাহে, আমরা সদলে দূরে কাছে সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বেড়াতাম। তার মধ্যে পুরাকীর্তিগুলিই প্রধান। এলিফ্যাণ্টা, কেন্‌হেরি বা কৃষ্ণগিরি, কার্লে ও নাসিকের গুহা, পঞ্চবটী, বেসিন দুর্গ, পুণায় পেশোয়ার দুর্গের অবশেষ, শিবাজীর সিংহগড় প্রভৃতি। তাছাড়া পাওয়াই হ্রদ, ভারসোভার সাগর-সৈকত এসব তো ছিলই। ডাক শুনে কেউ না এলেও মোমসাহেব একাই যাবেন।

মনের মধ্যে অনেকদিন থেকে অজন্তা-ইলোরা দেখার একটা ইচ্ছার আগুন ইন্ধনের অভাবে ক্রমে স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল, প্রস্তাবের ঘৃতাহুতি পড়তেই সেটা লেলিহান শিখা বিস্তার করল। রাজী হ'য়ে গেলাম। দলের অপর বন্ধুরা এবারে পিছিয়ে গেলেন।

কিছুদিন হ'ল ব্রাহ্মণী এসেছেন কোলকাতা থেকে। তিনিও দেখি নিজের তল্পিতল্পা গোছাতে আরম্ভ ক'রেছেন। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' এবং আরও কী যেন সব ভাল ভাল কথা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম, এখন সব কথা মনে নেই। কিন্তু সহধর্মিণী নাছোড়।

শাস্ত্রের অনুজ্ঞার প্রতি যাঁদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা আমি আদপে পছন্দ করিনে।

তাছাড়া, মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে শুধু আমি কেন—আমরা কেউ-ই চাইনে। কারণটা তো কারো অজানা নয়। শুধু শুধু

সেটা বলে লাভ কি? সেখানে তো আমরা—পুরুষরা—সবাই একমত।

স্যামুয়েল বাট্‌লার তাঁর 'নোটবুক'এ লিখেছেন, "সব বিচক্ষণ পুরুষ মানুষই মেয়েদের সম্বন্ধে একমত; আর কোন বিচক্ষণ পুরুষ মানুষ কোনদিন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে না সেই মতটা কি।"

"মেয়েদের বিষয়ে নির্ভেজাল সত্যি কথা আমি তখনই বলব যখন আমি কবরের মধ্যে একটা পা আগে রাখতে পেরেছি,—" টলষ্টয় একবার বলেছিলেন, "আমি কথাটা বলব, বলেই লাফিয়ে পড়ব আমার কফিনের মধ্যে, ঢাকনাটা আমার উপর চাপা দেব, আর বলব: এখন তোমরা যা খুশি তাই ক'রতে পার।"

বুঝে দেখুন, ঋষি টলষ্টয়ের মতো মুক্ত পুরুষ যে সাচ্চা জবান বল্‌তে হিম্মত পান না, আমার মতো ঘোর সংসারী অভাজনের বুকের পাটা এত বড় নয় যে সে কথাটা সজ্ঞানে উচ্চারণ করি।

তবে মেয়েদের মধ্যে অনেকেই যে নিজেদের বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন সে ভরসা চ্যাম্‌ফোর্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নর-নারীর মধ্যে যুদ্ধে পুরুষদের একটা মস্ত সুবিধা আছে। শত্রুপক্ষে বিভীষণের অভাব কোনকালেই নেই এবং তাঁরা সকলেই পুরুষদের দলে যোগ দিয়ে থাকেন।"

পঞ্চম-বাহিনী জিন্দাবাদ।

তবু মনে হয় কাজকি ঝামেলায় গিয়ে। যুদ্ধ কে চায়? আমি 'পঞ্চশীল'এ আস্থাবান। **War monger** দের আমি ঘৃণা করি।

অতএব কালক্ষেপ না ক'রে আমি শান্তির কবুতর উড়িয়ে দিলুম।

গৃহিণীর যাওয়া মঞ্জুর। বেণীর সঙ্গে মাথার মতো শিশুকন্যা কমলিকার যাওয়াও স্থির।

বোঝার উপর শাকের আঁটি হ'ল জয়লাল রাম। পুরাতন ভৃত্য। কল্যাণ স্টেশনে হুঁকো হাতে হাজির না হ'য়ে সে আগে ভাগেই কথাটা পাড়লো। চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে সে বলল, "আমারও বহুতদিনের খাইস আছে অজন্তা দেখার। দেশ থেকে এত দূরে এলাম আর দেখে যাব না। বুড়ো হ'য়েছি। জিন্দগীর কি কিছু ঠিক আছে ?"

অকাট্য যুক্তি। এই দার্শনিক তথ্যের উপর আর কথা চলে ? তাছাড়া, আমাদের মধ্যে শিল্প-রসিক বলে সেই-ই একমাত্র দাবী করতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সে অনেকদিন কাজ ক'রেছিল। খোদ অবন ঠাকুরের কাছে। কথায় বলে, কাজীর বাড়ির বাঁদীও দু'কলম লিখতে পারে। আর সে তো ছিল স্বয়ং বিশ্বকর্মার বান্দা। তার তো হক্ আছেই।

ক'দিন ধরে মহাসমারোহে গৃহিণীর কেনাকাটা চলেছে। হেন জিনিস নেই যা বাদ পড়ল।

শঙ্কিত হ'য়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি, "সেখানে তো আর বসবাস করতে যাচ্ছি না—"।

তাঁর যুক্তি, "বিদেশ-বিভুঁইএ কখন কোন জিনিসটা দরকার হ'য়ে পড়ে—"।

ওষুধপত্রই কেনা হ'ল কত রকম। তা দেখে একবার বলার চেষ্টা ক'রেছিলাম, "সবই তো হ'ল, শুধু পথে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন করা হঠাৎ যদি দরকার হ'য়ে পড়ে, সে জন্যে একটা টেবিল আর কিছু ছুরি কাঁচি সঙ্গে নিলে হ'ত না ?"

"যা বোঝ না তা নিয়ে তোমরা কথা বল কেন ?"—বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠ নয়,—বীণার ঝঙ্কার।

অতএব অবোধ্য জিনিস সম্বন্ধে কথা বলা বন্ধ করতে হয়।

নির্দিষ্ট দিন এল। তৈরী হ'য়ে বাইরের ঘরে বসে আছি। রওনা হতে বেশী দেরী নেই। সকালে অবকাশ হয়নি, খবরের কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় গৃহিণীর ঘরে জোর তলব পড়ল।

প্রিয়া-সন্দর্শনে যেতে যেতে অনুমান করলাম, নিশ্চয় কোন জটিল সমস্যায় পড়েছেন শেষ মুহূর্তে। ডাকতেই হবে। তিনি বারে বারে জোর গলায় আমার বুদ্ধির উপর যতোই অনাস্থা ঘোষণা করুন না কেন, আমি বেশ জানি আসলে আমার বুদ্ধির উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। পছন্দের উপরেও। সেদিন নান্নুভাই'এর দোকানে নেহাত আমার পছন্দ হ'য়েছিল বলেই তো মুক্তোর ব্রোচ্‌টা কিনলেন। না হ'লে একটা সাদামাটা হ'লেই তাঁর কাজ চলে যেত। তাড়াতাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসু হই। জিনিসপত্র নিয়ে তখন গলদঘর্ম অবস্থা। কিছুটা অন্যমনস্কও। প্রথমটা আমার উপস্থিতি টেরই পেলেন না। আবার সাড়া দিতেই বল্লেন, "এসেছ ? বোস তো একবার।"

"কী ব্যাপার ?" বলে চেয়ারটা টেনে বসতে যাচ্ছি, তিনি বাধা দিলেন।

ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "ওখানে নয়, ওখানে নয়,—এইখানে।"

বলে তাঁর বিশাল স্যুটকেশটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন।

ওহরি ! প্রয়োজন আমার বুদ্ধির নয়। বপুর।

মেধা নয়। মেদ।

স্যুটকেশটা সম্ভব-অসম্ভব জিনিসপত্রে বোঝাই হ'য়ে হাঁ করে আছে। তার উপর আমার দেহের গুরুভার দিয়ে বসে সেটাকে কাবু করতে হয়। সেটা যে আর কোনদিন খোলা যাবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হই।

এবারে বিছানার পালা। তার বাণ্ডিলটিকে অমানুষিক উদ্যমে আয়ত্ত করতে গিয়ে পট্ ক'রে হোল্ডলের বেল্ট আধখানা ছিঁড়ে গেল। টালটা ঠিক সামলাতে না পেরে আমিও ধরাশায়ী হই।

"পলকে প্রলয় আর কাকে বলে ? একটা সামান্য কাজ যদি পারো !···দেখি, কোথায় লাগলো আবার···।"

জয়লাল কুঁজোয় জল ভরে আনতে গিয়েছিল। এতক্ষণে দু'টো কুঁজো হাতে হাজির হওয়ায় আমি নিষ্কৃতি পেলাম।

মোমসাহেব ব্যস্তবাগীশ লোক। ভোরবেলা, কাকপক্ষী জাগেনি তখন থেকে তাগাদা দিতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। আর ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দু'য়েক আগে স্টেশনে এনে হাজির করলেন।

ভাবখানা, কলের গাড়ি কখন ছেড়ে দেয় বলা তো যায় না !

ফেব্রুআরি মাসের বিকেল। 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্' থেকে জি, আই, পি রেলের ক্যালকাটা মেলে চড়ে বসেছি।

গল্পগুজবে সবাই বেশ মেতে আছি। রাত্রি পৌনে ন'টা আন্দাজ একজন চেকার উঠলেন। টিকিট পরীক্ষা ক'রে জানালেন যে হয় রাত ন'টার মধ্যে এই কামরা থেকে নেমে যেতে হবে, নয় রাত পিছু সবাইকে দশ টাকা ক'রে মাসুল গুনতে হবে।

অপরাধ ?

না, 'কল্যাণ স্টেশন থেকে এই কামরাটিকে স্পেশাল বা শ্লিপিং সেকেণ্ড ক্লাসে পরিণত করা হ'য়েছে লেবেল এঁটে'।

'ভি টি স্টেশনে সেটা করা হয়নি কেন ?'

'সে আমার দেখবার কথা নয়, অথরিটিকে পরে জানাবেন। আমাকে কর্তব্য পালন করতে হবে।'

গল্পেই শোনা ছিল দিনের রানী রাত্রে রাক্ষসীর রূপ ধরে রক্ত চুষে খায়। এ কামরাটা দেখছি তাই হ'ল। দিনে রাতে রূপ পালটায়।

'দিনকা মোহিনী রাতকা ডাকিনী পলক পলক লহু চোষে।'

শেষ পর্যন্ত গাড়িসুদ্ধ লোকের অসহযোগে কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক রণে ভঙ্গ দিয়ে নেমে গেলেন।

রাত সাড়ে দশটায় আমরা নামলাম মানমাদ জংসনে। বোম্বাই থেকে একশ' বাষট্টি মাইল।

মানমাদ বোম্বাই স্টেট ও হায়দ্রাবাদ স্টেটের সীমা রেখার

কাছাকাছি। এখান থেকে নিজাম স্টেট রেলওয়ে ধরতে হবে আওরঙ্গাবাদের জন্য। মীটার গেজ ট্রেন। দিনে রাত্রে মাত্র দু'টি গাড়ি। আমাদের গাড়ি রাত প্রায় দেড়টায়। তাও সঠিক কেউ বলতে পারলেন না।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে পায়রার খোপের মতো এক ঘরে নিজাম স্টেট রেলওয়ের স্টেশন মাস্টারের দেখা মিলল।

তিনি কানে কম্ফটর জড়িয়ে একটি খাটিয়া আশ্রয় ক'রে বসেছেন। তাঁর পায়ের কাছে মেঝেতে উবু হ'য়ে বসে রয়েছে বোধকরি তাঁরই পয়েণ্টসম্যান। দু'জনেই গভীর তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন।

ট্রেনের খবর জিগ্‌গেস করাতে স্টেশন মাস্টার কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন এসব অশাস্ত্রীয় প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "রাত তিনটের আগে নয়"।

'তবে যে শুনলাম দেড়টা ?'

তিনি দমে যাবার পাত্র নন্। বললেন, 'সে যদি লেট না হয় তবেই'।

এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেই তিনি আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেভাবে বিজ্ঞ-প্রৌঢ়ত্ব চিরদিন অর্বাচীন-যৌবনকে দেখতে অভ্যস্ত।

বোঝা গেল তাঁর চেয়ে পোর্টারের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি মোমসাহেবের দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'চলুন, দেখা যাবে। চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি'।

ফেব্রুআরি মাসের প্রথম। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। তার উপর ঐ একটিমাত্র ট্রেনের জন্যে যা ভিড় দেখলাম, তাতে হৃৎকম্প হয়।

প্লাটফর্মের সর্বত্র গাদা করা লাগেজের উপর বহুলোক বসে রয়েছে। যেন এখানেই ক্যাম্প ক'রে থাকবে। কেউ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কোথাও জোর তর্ক লেগেছে। তাদের কণ্ঠ যেমন উচ্চ, ভাষাও তেমনি দুর্বোধ্য। আমাদের পাশেই একটা ছেলের অশান্ত চীৎকার আর তার মায়ের বক্‌বকানি আর বন্ধ হয় না। সেইসঙ্গে সোডিয়ম্ লাইটের আলো লোকেদের শ্রান্ত ক্লান্ত উত্তেজিত মুখের উপর পড়ে ঠিক মড়ার মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। যেন একদল প্রেতাত্মা প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে শেষ বিচারের সময়ের।

নিজাম রাজ্য তখন নানা ফন্দিবাজের শ্রীক্ষেত্র। ভাবতায় নম্বরি নোট ভাঙানো, সেখান থেকে মদ চোলাই করে বোম্বাই-এ আনা এই সব মহৎ কাজ চলেছে। কালোবাজারের বহু রন্ধ্রপথ দেখা দিয়েছে। উদ্যোগী পুরুষ মাত্রেই তৎপর হ'য়ে উঠেছে লক্ষ্মীলাভের জন্য।

বিশ্রামাগারে তিল ধারণের স্থান থাকলেও মাথা গোঁজার জায়গা নেই। একটু যেন দমে গেছি।

দেখলাম একটি চায়ের স্টলে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে,

"For all minor troubles of life turn to tea," কথাটা যেন Order of the night-এর মতো 'চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। কে বলে আমাদের Tea industryর ভবিষ্যৎ ভাল নয়? চা পড়তে পাচ্ছেনা। বহুলোক জড়ো হয়েছে। কিন্তু স্বাদে বোঝা গেল চা বাগানের চেয়ে ভিস্তিওয়ালার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। হোক, তবু গরম জল তো।

…যাত্রীরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কুলি দর্শন দিল। ট্রেন আসছে।…যুদ্ধং দেহি ভাব ক'রে সবাই তৈরী। হাঁক ডাকের আর অন্ত নেই।

কোন রকমে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় সকন্যা শ্রীমতীকে এবং লটবহর তুলে দেওয়া গেল বহুলোকের চোখ রাঙানি উপেক্ষা ক'রে। জয়লালকে তাঁদের খিদ্‌মতে সেখানে রেখে মোমসাহেব ও আমি প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছুটোছুটি লাগালাম। কিন্তু 'ছোট সে তরী'।

হন্যে হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। এমন সময় ডাক শুনলাম।

'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ—'শুনে নবকুমারের হৃদয়-বীণা বেজে উঠেছিল। মনে অপূর্ব ভাবোদয় হ'য়েছিল। হঠাৎ একজন লোকের মুখে 'জগহ খোজতা শেঠ?' শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম দু'জনেই।

'কেন, আছে নাকি?'

আমাদের সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে লোকটা দার্শনিকসুলভ

নির্লিপ্ততার সঙ্গে বল্‌ল, 'জগহ তো না মিলি'।

নিমেষে আশার বুদ্‌বুদ ফেটে গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য বোধ হ'ল। আর প্রচণ্ড রাগ হ'ল লোকটার এই রাত চোদ্দটার সময় ঐ জ্ঞান বিতরণ করার জন্যে।

আবার ছোটা আরম্ভ ক'রব এমন সময় লোকটা তেমনি নির্বিকারভাবে জানাল যে, জায়গার ব্যবস্থা সে করতে পারে তবে মাথা পিছু ছ'টাকা করে লাগবে। বারো টাকার বদলে, শেষ পর্যন্ত মোট সাত টাকায় দু'জনের রফা হ'ল।

লোকটা লেমনেড বরফের ভেণ্ডার। তার রিজার্ভ ছোট কামরা আছে। শীতের রাত্রে লেমনেড বরফের চেয়ে By-product জায়গা বেচায় লাভ বেশী। তারই সওদা করছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বল্‌তেন, 'টাকা ছড়ানো আছে। কুড়িয়ে নিতে জানা চাই'। কথাটা মিথ্যে নয়।

রিজার্ভ কামরার দু'পাশে দু'খানি বেঞ্চ সে আমাদের ছেড়ে দিল। মাঝখানে বেঞ্চের সমান একটি লম্বা বরফের বাক্স। তারই উপর শয্যা বিছিয়েছে এক মারোয়াড়ী। চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে গোল হয়ে শুয়েছে। দেহের কোথাও উঁচু নীচু নেই। সর্বত্র সমান। Same on all sides. তাকে সে অবস্থায় দেখে একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠা বিদুষী মহিলা ছিলেন সরোজিনী নাইডু। দীর্ঘ কর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় মহাত্মাজীকে যেমন তিনি 'মিকি মাউস' বলে পরিহাস করতেন তেমনি নিজের দৈহিক

স্থূলত্বের জন্যও তাঁর ব্যঙ্গোক্তির অন্ত ছিল না। একবার কয়েকজন বিদেশী সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার তাঁকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে পেয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন দেখতে পেয়ে তিনি তাঁদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন,—'Come, boys, hurry up. I am the same on all sides, fat and round.'

বিছানা পেতে বসেছি। এমন সময় গার্ড সাহেব এসে যাত্রী নেওয়ার জন্যে কপট তম্বি ক'রলেন। বরফওয়ালা নেমে গিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করে এল। বোঝা গেল, রোজই এমনি ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে থাকে। টাকা কত তাড়াতাড়ি হাত বদল হয়! লক্ষ্মী চঞ্চলা তাতে আর সন্দেহ কি?

সদ্য সাত্ সাতটা করকরে টাকা গুনোগার দিতে হ'য়েছে। মন খুব খারাপ। শোকাকুল মনকে কতো প্রবোধ দিলুম। যাক্, অমন ক'ত যায়। ভেবে আর কি হবে?···পরমহংসদেব কি বলেন নি, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'?···হায়, বৃথা চেষ্টা। অবোধ মন তবু ঐ সামান্য টাকা কটাকে কেন্দ্র ক'রে সাত্ সাত্তে উনপঞ্চাশ বার পাক খেয়ে ঘুরল।···

ট্রেন ছাড়ল। জানলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। দু'জনে গল্প করছি। কামরার দেওয়ালে উর্দুতে বয়েৎ-এর মতো কি সব লেখা। হয়ত' লেখা ছিল, 'আপন আপন জানমালের তদারক করহ। গাঁটকাটা ও বদমাস নিকটেই আছে।' অথবা ছিল রজাকরের ওজস্বিনী বাণী।

কিছুদিন আগেই নিজামরাজ্যে ভারতের বিসমার্ক সর্দার প্যাটেল

নিয়ন্ত্রিত অহিংস 'পুলিস এ্যাক্‌শন' হ'য়ে গেছে। রজাকরদের অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে চুরি-বাটপাড়ি খুন-খারাপিও করছে বলে শোনা যায়। বোম্বাইয়ে হিতৈষীরা অনেকেই পইপই ক'রে বারণ ক'রেছিলেন এ সময় 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে' পদার্পণ করতে।

তন্দ্রা এসেছে।···

হঠাৎ মোমসাহেব লাফিয়ে উঠলেন।

'কী হয়েছে?'

'আর হয়েছে, নিজামশাহী ছারপোকা!'

তখন বুঝলাম এ পথের নিত্য খরিদ্দার নাগরমল্ল খট্টমল্লের ভয়েই বেঞ্চের বদলে কেন বরফের বাক্সকে আশ্রয় ক'রেছিল। তার নাসিকা-গর্জন তখন ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে।

আমার বিছানাতেও ততক্ষণে হামলা সুরু হ'য়ে গেছে।

দেখা গেল ছারপোকার পাল। এইসা বড় বড়। এক একটা যেন Mobile Blood Bank.

শীতের শেষ যামে চুপ করে চোরের মার খাওয়া ছাড়া 'নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

এতদিন পরেও সেই ছারপোকাগুলোর কথা ভুলতে পারিনি। কোনদিন কি পারব? রক্তের সম্পর্ক যে!

আওরঙ্গাবাদ যখন এলো তখন তার অঙ্গ ফিকে কালো রঙের বোরকায় ঢাকা। তার ফাঁকে স্টেশনের গোটা দুই আলো চোখের

মতো দেখাচ্ছে। মোগল হারেমের রূপসী।···

ট্যাক্সিওয়ালা এসে সেলাম করল। সে আমাদের আপাতত আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে এবং সকালে এসে আমাদের ভ্রমণ-পথের সারথ্য গ্রহণ করবে।

স্টেশন থেকে বার হতেই কাস্‌টম্‌স অফিস। সেখানে সবাইকে যেতে হ'চ্ছে। খানাতল্লাশ চল্‌ছে। আমাদের আটকাল না ট্যুরিস্ট বলে। হয়ত চুনো-পুঁটি বলেই ছেড়ে দিল। তাদের নজর গভীর জলের রুই-কাতলার উপর।

কাছেই গেস্ট হাউস। সেখানের কর্তাকে আগেই লেখা হ'য়েছিল। মেঝেতে গালচে পাতা, খাট টেবিল চেয়ারে সাজান গোছান দু'টি ঘর আমাদের জন্যে রাখা ছিল। বেয়ারা দরজা খুলে দিল। মুখ হাত ধোয়ার জন্য প্রচুর গরম জল তৈরি রেখেছে। পাত্রভরা ধূমায়িত ও সুরভিত চা-ও অবিলম্বে হাজির হ'ল। নিদারুণ শীতের ভোরে সঞ্জীবনী চা হাতে পেয়ে মনে হ'ল এর নামই কি বিশল্যকরণী?

এতখানি আদর আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। খটমলকে মনুষ্য-রক্ত ভেট দিলে পুণ্য হয় বলে শোনা ছিল। কিন্তু সে পুণ্যের ফল যে এমন হাতে হাতে পাওয়া যায় তা জানা ছিল না। সখেদে বল্‌তে ইচ্ছে ক'রল, 'তখন কেন দিইনি আমার পাত্র উজাড় ক'রে'।···

## ॥ তিন ॥

সূর্যদেব বড় বেরসিক। কোন ফাঁকে কুয়াশার বোরকা খুলে নিতেই যে রূপসীর মুখোমুখি হ'লাম তাকে দেখে পুলক সঞ্চার দূরে থাক, শিউরে উঠতে হয়। সে বিগতাশ্রী তো বটেই তার উপর দারিদ্র্য তার সারা অঙ্গে চাবুকের ছাপ এঁকে দিয়েছে। অথচ একদিন একে অঙ্কশায়িনী করার জন্যে কত পুরুষ-সিংহের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। আর কেউ কেটা নয়, স্বয়ং শাহানশাহ্ বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব তাঁদের অন্যতম। তিনি যৌবনে এর শাসনকর্তা থাকাকালে এর প্রতি তাঁর অনুরাগ সঞ্চার হয় এবং শেষ বয়সে একে দখলে রাখার জন্যে তিনি জান কবুল ক'রেছিলেন। প্রাচীন 'খিড়কী' নাম বদলে নিজের নামে একে ধন্য ক'রেছিলেন।

প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই সারথি রথ সাজিয়ে হাজির। দরদস্তুর হ'ল। দু'দিনে আওরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, ইলোরা, অজন্তা সমস্ত দেখিয়ে আবার আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়ে আনবে। বড় গাড়ি। পাঁচজন আরামে বসা যায়।

আমরা রওনা হ'য়ে পড়লাম ভারত-ইতিহাসের বহু নাটকের রঙ্গমঞ্চ দৌলতাবাদ দুর্গের অভিমুখে।

প্রথমেই আওরঙ্গাবাদ শহরটি পরিক্রমণ করা গেল।··· প্রাচীন বিশাল জনপদের কঙ্কাল। একে দেখে অস্থিবিদ্যা হয়ত শেখা চলে, মুগ্ধ হওয়া যায় না।

লোকজন, দোকান-পসার, হাট-বাজার, যান-বাহন, বস্তি-প্রাসাদ আর হট্টগোল সবই আছে। নেই নগর জীবনের ছুটোছুটি আর হাঁপাহাঁপি। জীবনের স্রোত আলস্যে মন্থর। দারিদ্র্যে পঙ্গু।

আওরঙ্গাবাদের রাস্তায় বেরুলে চোখে পড়বে—যা আমাদের দেশের সর্বত্রই চোখে পড়ে—লোকেরা দরিদ্র, ভদ্র, শান্ত ও বন্ধুত্ব-পরায়ণ কিন্তু পথে রুগ্ন ভিখারীর ভিড়; ধোঁয়া আর ধূলো, নোংরা মানুষ আর জঘন্য পরিবেশ। স্তূপাকার আবর্জনা আর ঝাঁক ঝাঁক মাছি।···

এ বিষয়ে আমরা বড় বেশী উদাসীন। রত্নাকরের দেহের উপর বল্মীক হ'য়েছিল। কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। এ দেশে সবই সম্ভব। যা নেই ভারতে, তা নেই ভূ-ভারতে।

ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধীকে কোন এক বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন ক'রেছিলেন —

"ধরুন, আপনাকে যদি একদিনের জন্যে ভারতবর্ষের ডিক্টেটর ক'রে দেওয়া হয় তাহলে আপনি কি ক'রবেন ?"

মহাত্মাজী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন,—

"বড়লাটের প্রাসাদটি হাসপাতাল ক'রে দেব, আর একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সারাদিন মহানন্দে আবর্জনা সাফ ক'রে বেড়াব।"

"আর যদি দ্বিতীয় দিনের জন্যও আপনাকে ডিক্টেটর রাখা হয় ?"

"দ্বিতীয় দিনটিও," অল্প হেসে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন মহাত্মাজী, "প্রথম দিনেরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র।"

ঝানু সাংবাদিক ভেবেছিলেন মহাত্মাজী বুঝি কৌশলে তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু জাতির জনক সেদিন স্বাধীন দেশের নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্যের কথাই ঘোষণা ক'রেছিলেন।

আবর্জনার প্রতি আমাদের শুধু আকর্ষণ কেন সহজাত অনুরাগ রয়েছে। কি বাইরের আবর্জনা, কি অন্তরের আবর্জনা।

মহাত্মাজী বাইরের আবর্জনা সাফ করতে আরম্ভ করলে আমরা তাঁকে মেথর বলে গাল দিয়েছিলুম। আর অন্তরের আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা তুলতেই আমরা 'পুরুষোত্তম গান্ধীকে হত্যা করে মিষ্টান্ন বিতরণ ক'রেছি।

গান্ধী-হত্যার পরদিন।

৩১শে জানুআরি, ১৯৪৮।

খবরটা তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারিনি।...শঙ্কিত বুকে, কম্পিত হাতে অনেকগুলি সংবাদপত্র একের পর এক উল্‌টে চলেছি। যদি কোনটায় প্রমাণিত হয় এটা একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন; এটা শুধু নির্মম পরিহাস। মিরাক্‌ল্'এর যুগ তো শেষ নাও হ'য়ে থাকতে পারে? কিন্তু হায়! সবগুলো কাগজই উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রেছে এই নিদারুণ লজ্জাকর সংবাদ। এই আত্মঘাতী মূঢ়তা।...

বিশেষভাবে চোখে পড়ল, Hindusthan Standard পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটি। গোটা পাতাটি প্রায় সাদা। মাত্র এক কোণে বড় বড় হরফে লেখা,—'Gandhiji has been

killed by his own people for whose redemption he lived. This second crucification in the history of the world has been enacted on a Friday—the same day Jesus was done to death one thousand nine hundred and fifteen years ago. Father, forgive us. "

"হে ঈশ্বর, আমাদের মার্জনা করো। ক্ষমা করো।"—এ প্রার্থনা আজ সকলের।

কিন্তু ক্ষমা কি আমরা কোনদিন পাব? ক্ষমা কি চাইলেই পাওয়া যায়? না, ক্ষমার যোগ্য আমরা?

ভুলের হয়ত মার্জনা আছে। প্রথম অপরাধেরও বুঝি লঘু দণ্ড আছে। কিন্তু এ যে সুপরিকল্পিত অপরাধ। এ মহাপাপ যে আমরা বারে বারে ক'রে এসেছি।... এথেন্সের কারাকক্ষে সক্রেটিসের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিয়েছি, প্যালেস্টাইনের ঊষর-মরু-প্রান্তরে যীশুকে ক্রুশকাঠে বিঁধেছি, আজ আবার দিল্লীতে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীকে গুলি ক'রে মারলুম।...তবু কি আমাদের চৈতন্য হ'য়েছে? যুগে যুগে পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের ক'রতেই হবে। অন্তরে বাইরে যে অপরিসীম আবর্জনা, যে ঘোর মলিনতা আমাদের নরকের দ্বারে টেনে নিয়ে চলেছে, প্রগতির পথে অন্তরায় হ'য়েছে, তাকে পরিহার ক'রে নির্মল হ'তে পারলে তবেই হয়ত প্রায়শ্চিত্ত শেষে আমরা একদিন ক্ষমার যোগ্যতা অর্জন ক'রব। কিন্তু সে দিন কতদূরে?...

## ॥ চার ॥

আওরঙ্গাবাদ নগর-প্রাকারের ন' মাইল উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ লক্ষ উদয়াস্তের সাক্ষী দৌলতাবাদ দুর্গের সামনে এক গাছের ছায়ায় আমাদের গাড়ি থামল। আমরা সদলে দুর্গে প্রবেশ ক'রলাম।

প্রাসাদ, বাগান, ভাঙা মন্দির, মসজিদ, মিনার, বিশাল কামান দেখে বেড়ালাম। ঘণ্টা দুই ঘোরাঘুরি ক'রেও প্রায় কিছুই দেখা হ'ল না ভাল ক'রে। ক্লান্ত হ'য়ে বসলাম একটা জায়গায়। আর মনটা ইতিহাসের কবর খুঁড়তে লাগ্‌ল'।

এত বিরাট্‌ দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় আছে বলে জানিনা। হিন্দু রাজাদের রাজধানীরূপে দৌলতাবাদের প্রাচীন নাম ছিল দেওগড় অথবা দেবগিরি। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত যে এটিই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত গ্রীক ভৌগলিক টেলেমি (Ptolemy) বর্ণিত তাগারা।

আড়াই মাইল প্রাকারবেষ্টিত ছ'শ' ফুট উঁচু ক্রমসঙ্কীর্ণ-চূড়া পাহাড়ের উপর দেবগিরিতে কে এই দুর্গের পত্তন ক'রেছিলেন জানা যায় না। এর স্থাপত্য—বিশেষ ক'রে এর পরিখাপার্শ্ব দেখে স্থপতিরা অনুমান করেন যে, এই দুর্গ বৌদ্ধ আমলে ইলোরার প্রাচীনতম গুহাগুলির সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের।

আহবামল্লের দ্বিতীয় পুত্র চালুক্য-সম্রাট্‌ ত্রিভুবনমল্ল বা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের নাম কারো অবিদিত নেই। কবি বিল্হন রচিত

'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' গ্রন্থের ইনি নায়ক। এঁর রাজ্যকাল ১০৭৬-১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রকার, 'মিতাক্ষরা' রচয়িতা, স্মার্ত বিজ্ঞানেশ্বর এঁর রাজসভা অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। রাঢ় দেশে এঁরই সামরিক শাসনকর্তা হোয়সল বল্লাল বংশীয় সামন্ত সেনের বংশধর হলেন বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নরপতিগণ। লক্ষ্মণ সেনের মাদাইনগর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর মাতা রামা দেবী ছিলেন চালুক্য রাজকন্যা।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর—চালুক্যাভরণ শ্রীমদ্‌ভূলোকমল্ল—রচিত 'মানসোল্লাস' নামে গ্রন্থ আজও বিখ্যাত হ'য়ে রয়েছে। এঁর মৃত্যুর পর কল্যাণী অথবা কল্যাণের চালুক্য-সাম্রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। দু'টি অংশ অধিকার করেন যথাক্রমে অন্ধ্রদেশের কাকতীয়গণ এবং মহীশূরের হোয়সল-গণ। তৃতীয় অংশ মহারাষ্ট্রের যাদব রাজবংশের দ্বারা অধিকৃত হয়।

যাদবগণ এই দেবগিরিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন ক'রে প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করেন। দেবগিরিতে যাদব রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম ভিল্লম। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর ছিলেন।

এই যাদবগণ নিজেদের পুরূরবা-ঐল বংশীয় বা চন্দ্র-বংশীয় বলে পরিচয় দিতেন।...

নহুষ-পুত্র যযাতির ঔরসে ভার্গব-ঋষি উষানশ শুক্রের কন্যা দেবযানীর গর্ভে যদুর জন্ম হয়। ভোগ-লিপ্সু পিতার জরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় যদু রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে দক্ষিণ

পশ্চিম অঞ্চলে গিয়ে আনুমানিক ৩০১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নূতন রাজ্য গঠন করেন। যদুর নামেই যাদব বংশের প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তারে যাদবদের দান অনেকখানি। কিন্তু অনার্যভাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার জন্য উত্তরাপথের আর্য-ভাষীরা তাঁদের 'পতিত' মনে করতেন। পৌরাণিক যুগে যাদবগণের রাজ্যশাসন প্রণালী ইক্ষ্বাকু, কুরু এবং ম্লেচ্ছ (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বা বর্তমান গৌহাটীর রাজা ভগদত্ত) প্রভৃতি সাম্রাজ্য-প্রিয় রাজত্বগুলি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। যাদবদের বিভিন্ন শাখা একটি সমামেল বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি এবং কুকরু রাজ্যগুলি এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীন ছিল। যমুনা-তীরবর্তী মথুরার অধিপতি কংস পিতা উগ্রসেনকে বন্দী ক'রে অন্ধকগণের রাজা এবং এই সঙ্ঘের গণজ্যেষ্ঠ বা সভাপতি হন। দেবকী-পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ ছিলেন বৃষ্ণিগণের সঙ্ঘ-মুখ্য।...

প্রথম ভিল্লম-এর পৌত্র সিংহন বাহুবলে এই নবলব্ধ রাজ্যটিকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজত্বে পরিণত করেন। তিনি দণ্ডপানি সুশাসক এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পরবর্তী যাদব রাজগণও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পোষকতা ক'রেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেমাদ্রি, ব্যোপদেব, জ্ঞানেশ্বর প্রমুখ পণ্ডিতগণ দেবগিরির যাদব রাজসভা অশ্রয় ক'রে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন।...

* * *

সে সময় এলাহাবাদের সন্নিকটে কারা নগরের শাসনকর্তা ছিলেন আলা-উদ্-দীন খলজী। তিনি তখন স্নেহপ্রবণ খুল্লতাত

ও শ্বশুর দিল্লীর সুলতান জলাল-উদ্-দীন ফীরুজের সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে নিভৃতে বল সঞ্চয় ক'রছিলেন। সেজন্য সিক্কা ও সিপাহী দুই-ই দরকার। তিনি একের পর এক রাজ্য জয় ক'রে মাঝে কদিন বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় দেবগিরির ঐশ্বর্যের কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন।

'হারলে খুড়োর ভাগ্যে তিরস্কার, জিতলে আমার পুরস্কার' এই শুভবুদ্ধি নিয়ে, ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, খুড়োর অজ্ঞাতসারে রাজধানী অরক্ষিত থাকাকালে অতর্কিতে দেবগিরি আক্রমণ করলেন। পর পর দু'টি যুদ্ধে যাদবরাজ রামচন্দ্র দেবকে পরাজিত ক'রে প্রভূত ঐশ্বর্য হস্তগত করেন। এর দু'বছর পরেই, ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই, নদীবক্ষে বজরার উপর খুড়ো আলিঙ্গন করতে এলে তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে 'সিকন্দর সনি' অর্থাৎ দ্বিতীয় আলেক্জেণ্ডার এই উপাধি নিয়ে তিনি সুলতান হন। এই নামে তাঁর মুদ্রাও লাঞ্ছিত হত এবং 'খুৎবা' উপাসনায় তাঁর এই নাম উল্লেখ করার নির্দেশ ছিল।

অলা-উদ্-দীনের এই দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল দু'টি। প্রথমটি অর্থনৈতিক। খাজনা ও নজরানা বাবদ দাক্ষিণাত্যের ঘরের টাকা হু হু করে উত্তরে যেতে আরম্ভ করল। আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক। এই খল্জী-বিজয় বিন্ধ্যপর্বতের ওধারের ভূমিতে প্রথম কোন মুসলমান বাদশার পতাকা বহন ক'রে নিয়ে গেল এবং ভাবী সাম্রাজ্যের পথ প্রশস্ত ক'রে তুলল।...

কামিনী আর কাঞ্চনের প্রতি অলা-উদ্-দীনের দুর্বলতা আর

পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো একটু বেশীই ছিল ।

দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে কাঞ্চন-তৃষ্ণা কিছুটা মিটলে লালসার প্রতিমূর্তি অলা-উদ্-দীন কামিনীর তৃষ্ণায় মেবারের গিহ্লোট বা শীশোদীয় রাজকুলবধূ পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য সর্বস্ব পণ ক'রেছিলেন। কপালে জুটেছিল ছাই। রূপশিখাময়ী পদ্মিনী আর বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর চিতাভস্ম।...

এদিকে রামচন্দ্রদেব খাজনা পাঠানো বন্ধ করলেন। শুধু তাই নয়, সুলতানের শত্রু গুজরাটের অধীশ্বর বাঘেলা বংশীয় দ্বিতীয় রায় কর্ণদেবকে সকন্যা এই দুর্গে আশ্রয় দেওয়ায় সুলতান তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি মালিক কাফুরের অধিনায়কত্বে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেবগিরিতে সৈন্য প্রেরণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দেশকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে মালিক কাফুর রামচন্দ্র দেবকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুলতান বিদ্রোহী রাজাকে বশীভূত করার জন্যে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ক'রে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করালেন এবং তাঁকে খেতাব দিলেন 'রায়-ই-রায়ান'।

বিজেতারা পরে রায় কর্ণদেবের কন্যা দেবলা দেবীকেও বন্দী ক'রে দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রায় কর্ণদেবের রানী কমলা দেবীকে সুলতান আগেই নিজের বেগম বানিয়ে হারেমের শোভা বৃদ্ধি ক'রেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিণয়।

আমীর খসরু খিজির খান ও দেবলা দেবীকে নিয়ে প্রেম-কাব্য রচনা ক'রেছেন। খিজির খান ও দেবলা দেবী নাকি চাঁদ ও চকোরের মতো পরস্পরের প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে বিয়ে করেন।

আসলে ব্যাপারটা হ'য়েছিল অন্য রকম। প্রেমে পড়ে খিজির খানকে বিয়ে করার বয়সই তখন দেবলা দেবীর হয়নি।

গুজরাটের অন্‌হিলওয়ারা থেকে রাজ্যচ্যুত কর্ণদেব শিশুকন্যা দেবলা দেবীকে বুকে নিয়ে রামচন্দ্র দেবের আশ্রয়প্রার্থী হন। রামচন্দ্র দেব শরণাগতকে শুধু অভয়ই দিলেন না, তাঁকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যও দান করেন। তনয়াকে নিয়ে কর্ণদেব সেই রাজ্যে চলে যান। রামচন্দ্র দেবের ছেলে শঙ্কর দেবলা দেবীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু যাদবরা বংশমর্যাদায় বাঘেলা রাজপুতদের চেয়ে নীচু। এজন্য কর্ণদেব এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না।

ওদিকে কমলা দেবী মেয়েকে কাছে চান। তিনি অলা-উদ্‌-দীনকে প্ররোচনা দিলেন দেবলা দেবীকে দিল্লীতে আনার জন্যে। বেগতিক দেখে তখন কর্ণদেব বংশমর্যাদা ভুল্‌লেন। যাদব রাজকুমার শঙ্করের সঙ্গে কন্যার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে কয়েকজন রক্ষী সঙ্গে দিয়ে কন্যা দেবলা দেবীকে দেবগিরি রওনা করিয়ে দিলেন।

রক্ষীদল পথে ইলোরার বিখ্যাত গুহা-মন্দিরগুলি দেখার জন্য থামে ও সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে থাকে। ছোট্ট মেয়েটি খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। এমন সময় অলা-উদ্‌-দীনের কয়েকজন পাঠান সৈনিক—যারা গোপনে এদের

অনুসরণ ক'রছিল—দেবলা দেবীকে ধরে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় দিল্লীর অভিমুখে। রক্ষীদল খুঁজতে এসে দেখে কিশোরী রাজকন্যা নেই। মন্দির প্রাঙ্গণে পড়ে আছে শুধু তার আঁচলের ক'টি চাঁপা ফুল।

কমলা দেবীর শাহজাদা খিজির খানকে জামাই করার বাসনা সফল হ'ল। দেবলা দেবীর বয়স তখন মাত্র আট বছর।

স্বীকার করি সেকালে ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে পরিণত হ'ত দেহে ও মনে। অকালে না হোক সকালে পাক্‌ত। কিন্তু তাই বলে এত ভোরে ?

দেবগিরিতে এই দ্বিতীয় পাঠান অভিযান অলা-উদ্‌-দীনের রাজকোষ পূর্ণ ক'রে তোলে আশাতিরিক্তভাবে।

সুলতানের অন্যতম সভাকবি আমীর খসরু 'তুঘলুকনামাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন যে, দাক্ষিণাত্য থেকে পঞ্চাশ হাজার মণ সোনা এবং তাছাড়া এত প্রচুর হারে মুক্তো জহরত দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয় যে এক হাজার উট সেগুলির ভারে নুয়ে পড়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে দিল্লী পৌঁছেছিল। এ ছাড়া বিশ হাজার ঘোড়া এবং তিনশ' বারোটি হাতিও বিজেতারা নিয়ে গিয়েছিল।

অলা-উদ্‌-দীন ছিলেন শক্তিমান স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্‌। তাঁর আকাঙ্খা ছিল সীমাহীন এবং তা চরিতার্থ করার জন্য যে-কোন পথ অবলম্বন করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

একদিকে তিনি কাব্য ও শিল্পের পোষকতা ক'রেছেন, অপর দিকে ঘোর বর্বরতার পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অলা-উদ্‌-দীনের আগে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের কেউ-ই ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে, বাহুবলে ও রাজ্যশাসনের দক্ষতায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। সেই সঙ্গে তাঁর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতাও ছিল অতুলনীয়।

ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণকারী মোঙ্গলদের বলত 'নই মুসলমান'। 'নই মুসলমানরা' বিদ্রোহী হ'লে অলা-উদ্‌-দীনের আদেশে বিশ-তিরিশ হাজার 'নই মুসলমানকে' হত্যা ক'রে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের বিলিয়ে দেওয়া হয় নগরের ঝাড়ুদারদের মধ্যে।

ফেরিস্তা যথার্থই বলেছেন, 'অলা-উদ্‌-দীনের রাজনীতির কথা ভাবলে আমাদের চোখের সামনে একজন মহান্ ও কুশলী নরপতির ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু যদি তাঁর হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ে, আমরা দেখতে পাব সে হাত দু'টি মানুষের রক্তে লাল হ'য়ে আছে এবং তখন ঐ মহান্ নরপতির ছবি পরস্বাপহারা আততায়ীতে রূপান্তরিত হবে। তিনি নৃশংসতার মধ্যে জীবন আরম্ভ করে-ছিলেন এবং রক্তস্রোতের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেছেন অন্তিমকাল পর্যন্ত'।...

বর্‌ণী 'তারিখ-ই-ফিরূজশাহী'তে লিখেছেন, 'প্রাচীন মিসরের ফারাওগণও অলা-উদ্‌-দীনের মতো অযথা নির্দোষীর এত রক্তপাত করেন নি।...

কমলা দেবী ও কাফুরের ষড়যন্ত্রে অলা-উদ্‌-দীন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। অথচ এই বিশাল জগতে মাত্র এই

দু'জনকেই তিনি বিশ্বাস ক'রেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাফুর খিজির খানকে অন্ধ ক'রে দিয়ে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করেন। অলা-উদ্-দীনের মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ দিন পরে কাফুর প্রাসাদরক্ষীদের হাতে নিহত হন।

*

অলা-উদ্-দীনের তৃতীয় পুত্র কুতুব-উদ্-দীন মুবারক শাহ্ যেমন বিলাসপরায়ণ তেমনি নৃশংস। পাঁচ বছর বয়সের ভাই সাহাবুদ্দীনকে অন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করেন।

ইনি নৃত্য-বিশারদ ছিলেন এবং শোনা যায়, তিনি নাকি নর্তকীর পোষাক পরে থাকতে ভালবাসতেন। কলিকালের বৃহন্নলা!

না। অতদূরে যেতে হবে কেন? রোমের সীজার ক্যালিগুলাও নর্তকীর পোষাক পরতে ভালবাসতেন। ভেনাস সেজে তিনি রোমের পথে পথে ঘুরতেন।

নৃপ-নন্দনদের কথাই আলাদা!

মুবারক শাহের সময়ে দেবগিরির রাজা হরপালদেব ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী হ'য়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন রামচন্দ্র দেবের জামাতা। মুবারক শাহ্ স্বয়ং বিপুল বাহিনী নিয়ে দেবগিরিতে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিলেন।...

পরাজিত হরপাল দেব পলায়ন করেন। কিন্তু তাঁকে ধরে এনে জীবন্ত গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে নগর তোরণে টাঙিয়ে

দেওয়া হয়। এই ভাবে সুপ্রাচীন যাদব রাজত্বের অবসান ঘটল।...

...রাজত্ব গেল বটে কিন্তু এই বংশের রক্তের তেজ কম্‌ল' না। এঁদের রক্তের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ রয়ে গেল।...অনেক দিন পরে, এই বংশেরই যদু রাও'এর কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া জীজা বাঈ'এর গর্ভে সন্তানরূপে এসেছিলেন ত্রিপুরারি শঙ্করের ন্যায় ভয়াল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। তাঁর পরাক্রমে দিল্লীর চাঘতাই তুর্ক বাদশার মসনদ কেঁপে উঠেছিল। তাঁরই প্রেরণায় ও একতার মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে মহারাষ্ট্র অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হ'য়েছিল।...

বছরখানেক দেবগিরির এই দুর্গে আরামে কাটিয়ে, মন্দিরের পাথরে একটা বড় মসজিদ তৈরী করিয়ে, মুবারক শাহ্ 'অল্-ওয়াসিক-বিল্লাহ্' অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ খালিফ-এই উপাধি ধারণ করে দিল্লী ফিরলেন। দিল্লী ফিরলেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাষ পেয়ে। কয়েকজন সভাসদ অন্ধ খিজির খানের ছেলেকে দিল্লীতে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা কর'ছিলেন।

রাগে টং হ'য়ে মুবারক গোয়ালিয়ারে সৈন্য পাঠালেন খিজির খান ও তস্য পুত্রকে কোতল করতে।

আমীর খসরু লিখেছেন যে, দেবলা দেবী তাঁর স্বামীকে রক্ষা করার জন্যে দু'হাতে তাঁকে আগলে দাঁড়ান। জল্লাদের দল তাঁর হাত দু'টি কেটে তবে খিজির খানকে হত্যা করতে পারে। রূপরম্য দেবলা দেবীর প্রাণহীন চারুদেহ স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে।

এর কিছুদিন পরেই মুবারক শাহের পেয়ারের উজীর খসরু খানের লোক এক রাত্রে তাঁকে ছুরি মেরে খল্‌জী রাজত্বেরও সমাপ্তি ঘটাল।

* * *

এরপর এই দুর্গের রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের সামনে দেখা দিলেন নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিতপ্রবর জৌনা খান্‌। শস্ত্র আর শাস্ত্র অসি আর মসি দুয়েতেই সমান দখল। ফিলসফার কিং। প্লেটোর মানসপুত্র, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া মগজ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃদয়ঙ্গম ক'রলেন যে তাঁর আশে-পাশে সবাই ঘাড়ের উপর একটা করে মুণ্ডুর বোঝা বৃথাই বয়ে বেড়াচ্ছে। মাথা যদি থাকে তো শুধু তাঁর। আর সে কী মাথা! শুধু প্ল্যানে ভর্তি। প্ল্যানগুলোকে সফল করে তুলতে হ'লে দিল্লীর তখ্‌ৎ'এ তাড়াতাড়ি বসা দরকার। কিন্তু সে পথে কাঁটা। বানপ্রস্থ নেবার বয়স অনেকদিন পার হলেও বাপ গদি আঁকড়ে আছেন।

দার্শনিক জৌনা জানতেন নশ্বর এই জীবন। শুধু দুদিন আগে আর পরে। অমনি প্ল্যান এঁচে ফেল্লেন মনে মনে। সুযোগ ঘটতেও দেরি হ'ল না।

বাপ ঘিয়াস-উদ্‌-দীন তুঘলুক শাহ্‌ বঙ্গ-মিথিলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ফিরছেন। জৌনা দিল্লী থেকে কিছু দূরে—আফগানপুরে—এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করার জন্য এক অপূর্ব কাষ্ঠ-মণ্ডপ তৈরি করালেন। সে মণ্ডপের নির্মাণ কৌশল

দেখ্‌লে শকুনি মামাও তাজ্জব ব'নে যেতেন। পাণ্ডব-ভাগ্নেদের জন্যে তাহ'লে আর অপদার্থ পুরোচনকে দিয়ে বাজেমার্কা জতুগৃহ তৈরি করানই সার হ'ত না তাঁর।

বলা বাহুল্য জৌনার প্ল্যান আমাদের 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান' নয়। অচিরাৎ ঠিক ঠিক উত্‌রে গেল। বাপের মাথায় আকাশ ভাঙার মতোই মণ্ডপ ভেঙে পড়ল। আর ফকর-উদ্‌-দীন মুহম্মদ জৌনা খান, মুহম্মদ বিন্‌ তুঘলুক হ'য়ে সিংহাসন আলো ক'রে বসলেন।···

জৌনার এই প্ল্যানের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ৫৯ শতকের রোমের সম্রাট্‌ নেরোর প্ল্যানের কিছুটা মিল আছে। থাকার কথাই। মহাজনদের চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য কিছুটা থাকেই।

নেরো বহু-বল্লভা জননী এগ্‌রিপ্পিনাকে ইহজগত থেকে কৌশলে সরিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে নিয়ে নৌকা-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন টাইবার নদীতে। ব্যবস্থা মতো যথাসময়ে বজরার ভারী চাঁদোয়া রাজমাতার মাথায় খ'সে পড়ল আর নেরো স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর অপঘাতে 'অজ-বিলাপ' সুরু ক'রে দিলেন। সম্রাটের প্রবল শোক দেখে রোমের প্রজারাও চোখের জল রাখতে পারেনি। আর পারিষদ দলের তো কথাই নেই। রাজা যত কাঁদে পারিষদ দল কাঁদে তার শতগুণ।

সম্রাট্‌ মুহম্মদ বিন্‌ তুঘলুককে দিল্লীবাসীরা সমবেদনা জানাল ও সান্ত্বনা দিল। তবে আড়ালে বল্‌ল, 'পিদর কুশ'। বল্‌ল, 'খুনী সুলতান'। তা বলুক। নিন্দুকেরা হিংসেয় অমন অনেক কথাই বলে থাকে। সব কথায় কান দিলে কি চলে? কোন

বুদ্ধিমান লোকই আড়ালে কে কি বলে সে নিয়ে মাথা ঘামান না।

এ্যারিস্টটল্‌কে একবার একজন বলে, 'অমুক আপনার নিন্দে ক'রছিল'। এ্যারিস্টটল্ হেসে জবাব দেন, "শুধু নিন্দে কেন, সে আমার অসাক্ষাতে আমাকে যত খুশি চাবুক দিয়ে মারলেও আমার কিছুই যায় আসে না।"

মুহম্মদ-বিন্-তুঘলুকেরও মনের ভাব কতকটা সেই রকম।

সুলতান মন্ত্রী-ফন্ত্রী কারো কথায় বড় একটা কর্ণপাত ক'রতেন না। তিনি একাই একটা 'ব্রেন্‌স্ ট্রাস্ট'।

বছর দুই রাজত্ব করার পর ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে নিয়ে যাবার প্ল্যান ক'রলেন।

কাজ ফেলে রাখার লোক তিনি নন্। তখনই ফরমান জারি হ'য়ে গেল, তিন দিনের মধ্যে দিল্লীবাসীদের দেবগিরি রওনা হ'তে হবে।

হুকুম মাফিক দেবগিরির এই দুর্গটি সংস্কার করা হ'ল। পরিখা খনন, প্রাচীর নির্মাণ এবং নগরে বহু প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করিয়ে দেবগিরির নাম পরিবর্তন করা হ'ল,—দৌলতাবাদ। সেই নাম আজও কায়েম হ'য়ে রয়েছে।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে উজির-নাজির, সেপাই-সান্ত্রী, বেগম-বান্দা, বণিক্-ব্যবসায়ী, মোল্লা-পুরুত মায় দিল্লীবাসী প্রত্যেককে জোর ক'রে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিলেন সাতশ' মাইল রাস্তা ; চল্লিশ দিনের পথ।

সুলতানের একজন বিশ্বস্ত সহচর ও ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্-দীন বর্‌ণীর লেখার উপর নির্ভর করলে বল্‌তে হয়, মেয়ে-মদ্দ, আণ্ডা-বাচ্চা, জোরু-গরু তো বটেই দিল্লী ও তার আশেপাশের কুত্তা-বিল্লি পর্যন্ত বাদ গেল না। ফাঁদ পেতে কাক-চিল ধরা হ'য়েছিল কি না সে বিষয়ে অবশ্য চারণেরা নীরব।

হাবশী পরিব্রাজক আবু আবদুল্লা ইবন্ বতুতা ছিলেন সুলতানের বেতনভুক্ দিল্লীর প্রধান কাজী। তিনি লিখেছেন যে, একজন অন্ধকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে গোটা পথটা নিয়ে যাওয়া হয়। তার নাকি ঠ্যাং দু'খানি মাত্র দৌলতাবাদে পৌঁছেছিল।

বাকী লোকদেরও অনেকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পথকষ্টে ও মহামারীতে সুলতানকে ফাঁকি দিয়ে অক্কা পেয়েছিল। নতুন রাজধানীর জলুস আর প্রতিষ্ঠা দিবসের ধুম-ধড়াক্কা, নাচ-তমাশা, বাজি-পোড়া, চরকি-ঘোরা দেখা তাদের দগ্ধ-ভাগ্যে ঘটেনি।

কিন্তু সুলতানের একটা মহৎ গুণ ছিল। নিজের ভুল চোখে পড়লে তা অবিলম্বে সংশোধন করতে চাইতেন। তার জন্যে যাই হোক, তিনি কারো পরোয়া করতেন না। যেমনি দেখলেন নতুন রাজধানীতে নিদারুণ জলকষ্ট ( তুচ্ছ জলের ব্যবস্থার কথাটা তাঁর প্ল্যানে রাখা প্রয়োজন বোধ করেননি ) ওমনি আবার হুকুম দিলেন, 'ফিরে চলো দিল্লী'।

'দিল্লী দূর অস্ত্' এ সামান্য যুক্তি কেন, কারো কোন অজুহাত ওজর আপত্তিই সম্রাটের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে টিঁকলো না।

দিল্লীর পথে কদম বাড়াতেই হ'ল।

যাবার সময় দার্শনিক-সুলভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে দৌলতাবাদের অবশিষ্ট দৌলতটুকু নিংড়ে সঙ্গে নিতে তিনি ভোলেন নি।···

বাদশা তো দৌলত হাতিয়ে ফিরলেন। তেলা মাথায় তেল পড়ল! কিন্তু রুখু-মাথা প্রজারা? তাদের ট্যাক একেবারে রামলীলা ময়দান। কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ক'রে দিল্লী-দৌলতাবাদ আনাগোনা ক'রতেই তারা ফতুর হ'য়েছে। তার উপর বাদশা চীন দেশে অভিযান করার প্ল্যান ক'রেছেন। অটুট্ সঙ্কল্প। রসদ জোগাতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? রূপেয়া কাঁহা?

বক্শী খাজাঞ্চী সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

বাদশা বল্লেন, 'টাকার জন্যে ভাবনা? কুছ্ পরোয়া নেই। নোট ছাপো।'

নোট? সে আবার কি বস্তু?

বাদশা বল্লেন, 'বহুৎ উম্‌দা চীজ। এখনও আমার মগজের গর্ভে রয়েছে, পয়দা হয়নি। এটাই আমার সবচেয়ে সেরা প্ল্যান। তামাম দুনিয়া একদিন এর জন্যে আমায় তস্‌লীম ঠুক্‌বে।'

খোদ বাদশার তদারকে পাতলা চামড়ার টুকরো কেটে তাতে বাদশাহী পাঞ্জার মোহর দিয়ে নোট তৈরি হ'ল। ভল্ল উঁচিয়ে সেপাইরা সেই নোট বাজারে চালু ক'রল। প্রজারা কিন্তু দু'দিনের মধ্যে এলেম শিখে ফেল্‌লে। তারা জুতোর সুখতলা খুলে তাতে দু'একটা ছাপছোপ দিয়ে হাট-বাজার ক'রতে লাগ্‌ল। কিন্তু এমন রামরাজত্বি ক'দিন চলে? কারেন্সি কোল্যাপ্স ক'রল।···

* * *

বাদশাহ্ মুহম্মদ বিন্ তুঘলুকের প্রলয়ঙ্কর রাজবুদ্ধিতে উত্যক্ত হ'য়ে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী ওমরাহগণ এই দুর্গ অধিকার ক'রে এখানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রথমে কিছুদিন ইসমাইল মুখ নামে বৃদ্ধ ও আয়েসী একজন আফগান নাসির-উদ্-দীন শাহ্ উপাধি নিয়ে রাজত্ব করেন। পরে তিনি বিদ্রোহীদের যোগ্যতম নেতা হাসানকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। হাসান ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আবুল-মুজঃফ্ফর-অলা-উদ্-দীন বাহমন শাহ্ উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে দাক্ষিণাত্যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীর সুলতানীর ভগ্নাবশেষের উপর যে কয়টি স্বাধীন মুসলিম রাজত্ব গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে দাক্ষিণাত্যের এই বাহমনী রাজত্ব শৌর্যে ও সম্পদে সবচেয়ে শক্তিশালী। এই বংশের দশম রাজা অলা-উদ্-দীন আহ্মদ শাহ্। তাঁর বীরত্ব ও বদান্যতার খ্যাতি ছিল। ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবত বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্য জয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে, পারশীক স্থপতিকে দিয়ে এই দুর্গের মধ্যে তিনি দু'শ দশ ফীট উঁচু ও সত্তর ফীট বেড়ের একটি সুন্দর শুভ্র মিনার নির্ম্মাণ করান। চাঁদ মিনার। দক্ষিণাপথে এই মিনারের তুলনা নেই।

* * *

দুর্গের মধ্যে যে জায়গায় বসে আমরা বিশ্রাম করছি, তার নাম 'চিনি মহল'।

নামটি বেশ মিষ্টি শোনালেও এর স্মৃতি বড় তিক্ত।

এই মহলে আবুল হাসান দশ বছর বন্দী-জীবন কাটিয়ে ছিলেন।

গোলকুণ্ডার শেষ কুতুবশাহী সুলতান আবুল হাসান।

মুঘল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁর রাজ্য আক্রমণ ক'রলে তিনি আট মাস ধরে মুঘল বাহিনীর সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করেছিলেন। জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু…সর্দার খাঁ…বেইমান সর্দার খাঁ…।

…বারে বারে যুদ্ধে হেরে গিয়ে মুঘল-বাহিনী আত্মপ্রত্যয়শূন্য হ'য়ে পড়ল।…বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মুঘল সৈন্য উজাড় হতে লাগল। আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে সৈন্যেরা,—বড় বড় তালেবর সেনাপতিরা নাকে কানে খৎ দিয়ে—যার যেখানে খুশি পালাতে আরম্ভ ক'রল।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা।

কত লোক যে মারা পড়ল তার আর ইয়ত্তা নেই।

একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "রোজ গাদা গাদা মড়া জমতে লাগল। কয়েকমাস পরে, বর্ষাকাল গত হ'লে, সাদা কঙ্কালের স্তূপগুলি একটু দূর থেকে দেখলে মনে হ'ত যেন তুষারাবৃত পর্বতমালা।"…

কিন্তু আওরঙ্গজেব দম্‌বার পাত্র নন্।

তিনি দুর্গ অবরোধ ক'রে থেকে বার বার নূতন সৈন্য সমাবেশ ক'রতে লাগলেন। নিজে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে থাকলেন।

তবু সব বৃথা।

সম্রাটের অর্থ, সামর্থ্য, বিক্রম, বৈভব, মান, মর্যাদা—সব

গোলকুণ্ডার ধূলোয় মিশে গেল।

তবে কি পরাজয়ের কালিমা নিয়েই ফিরবেন সম্রাট্ আলম্‌গীর?

পরাজয় ?···

অপরাজেয় আলম্‌গীরের পরাজয় ?—অসম্ভব।

···একজন শিয়া মুসলমান—কাফের বল্‌লেই হয়—তার কাছে হেরে যাবেন তিনি? কাফের সুলতানটার আবার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। তার উপর পার্বত্য-মূষিক মারাঠাদের সঙ্গেও তার সদ্ভাব আছে।···

নিভৃতে করতলে শুভ্র শির ন্যস্ত ক'রে ভাবতে বসলেন তিনি। ললাটের গভীর রেখাগুলো সাপের মতো কিল্‌বিল্ ক'রে উঠল।···

জগতের পাঠশালায় মানব-চরিত্র অধ্যয়ন ক'রেছেন তিনি। তলোয়ার আর কামানের গোলার শক্তির উপর বিশ্বাস হারালেও লালসা ও বিশ্বাসঘাতকতার ইন্দ্রজালে তিনি চিরদিন আস্থাবান।··· এই ইন্দ্রজালই তাঁকে 'তখ্‌ৎ-ই-তাউস্'-এ বসিয়েছে। না হ'লে ফকিরি নিয়ে তাঁকে সত্যই মক্কা-শরীফে যেতে হ'ত বহুদিন আগে।

কুকুরকে রুটি দিলে সে পা চাট্‌বেই—এ জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁর তখনও ছিল।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য···।'

···জুটে গেল।

কুকুর নয়,—মানুষ। অন্তত আকৃতিতে।

রুটি নয়,—চাঁদির জুতি।

চাঁদির জুতিতে কুচক্রী আওরঙ্গজেব সুলতানের বিশ্বাসভাজন একজন সৈন্যাধ্যক্ষের বিবেককে বশীভূত ক'রে ফেল্লেন।

আবতুল্লাহ পাণী ওরফে সর্দার খাঁ।

প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে বিক্রি ক'রে দিল তার মনিবকে। যেমন ক'রে মাত্র তিরিশটি রজতখণ্ডের বিনিময়ে 'ঈশ্বরের পুত্র'কে বিক্রি ক'রে দিয়েছিল সাইমনের পুত্র জুডাস্ ইস্কেরিয়ট।...

২রা অক্টোবর, ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। নিশুতি রাত্রে গোলকুণ্ডার তুর্গের খিড়কির দরজা খুলে দিল সর্দার খাঁ।

সেই গোপন পথে কয়েকজন মুঘল সৈন্য প্রবেশ ক'রে প্রধান তোরণের অর্গল মুক্ত ক'রতেই বিপুল মুঘল বাহিনী তুর্গে প্রবেশ ক'রল।

কিন্তু ভগবানের এই চিড়িয়াখানা শুধু কুকুর-শেয়ালেই ভর্তি নয়। সিংহ-শার্দূলও আছে।

এক পুরুষ-সিংহ গর্জন ক'রে লাফিয়ে পড়ল একটা থামের আড়াল থেকে।

একা।

কিন্তু যত শক্তিই সে ধরুক এই প্রবল বন্যা-স্রোতকে একা ঠেকাবে কি ক'রে?

ঠেকাবে কতক্ষণ?

দেহে সত্তরটি আঘাতের চিহ্ন নিয়ে ধরাশায়ী হ'ল আব্দুর-রজ্জাক-লারী।...গোলকুণ্ডার একজন নিমকহালাল সামান্য সৈনিক।

আর তার দেহের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল বন্যার স্রোত।

তা যাক্। কিন্তু বীরত্বের ইতিহাসে অমর হ'য়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মেবারের গোরা, বাদল আর গোলকুণ্ডার হীরের

খনির উজ্জ্বলতম রত্ন এই আব্‌দুর-রজ্জাক-লারী।...

গোলকুণ্ডা অধিকার ক'রে সুলতান আবুল হাসান কুতুবশাহকে দৌলতাবাদ দুর্গের এই 'চিনি মহলে' বন্দী ক'রে রেখেছিলেন আওরঙ্গজেব।

মুঘলেরা এই দুর্গ আগেই অধিকার ক'রেছিলেন আহমদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের কাছ থেকে।

এইখানে আওরঙ্গজেব সেনাপতি মীর-জুম্‌লাকেও বন্দী ক'রে রেখেছিলেন গৃহযুদ্ধের সময় সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে।

এই দুর্গেরই এক প্রকোষ্ঠে জন্ম হ'য়েছিল শাহ্‌জাদী জেব-উন্নিসার। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শিবাজীর অনুরাগিণী। বন্দীশালা থেকে মেঠাইয়ের ঝুড়িতে ক'রে চম্পট দিয়ে শিবাজী যখন আওরঙ্গজেবের চোখে ধূলো দিয়েছিলেন, সে ধূলোর অনেক-খানি জুগিয়েছিলেন অম্বরের মির্জারাজা জয়সিংহ ও শাহ্‌জাদী জেব-উন্নিসা।

মুঘলের কাছ থেকে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে এই দুর্গ আসে হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজাম—নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক আসফ জাহ-এর হাতে। সেদিন পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরাই এটি ভোগ-দখল ক'রেছেন। মাত্র কিছুদিন আগেও ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দার কাশেম রজ্‌ভী, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ ও রজাকর বাহিনী এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন।

*

স্বনামধন্য কাশেম রজ্‌ভী।

বেঁটেখাট লোকটি। গলাবাজিতে জোড়া পাওয়া ভার। সাম্প্রদায়িকতার বিষে পেট ভর্তি। রাজনীতিতে ছুঁচোর মতো কানা।

ওকালতিতে টু পাইস্ হ'চ্ছিল কাশেমের। কিন্তু 'তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত' ?

দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে

গাউনখানি চেপে,…( থুড়ি, চাপিয়ে )।

'ইস্‌লাম বিপন্ন'—বলে

হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !

ধরল ঘোড়া রোগে।·· কাশেম ইত্তেহাদ-উল্-মুসলিম' এর নেতা হ'য়ে চোগা-চাপকান ছেড়ে পরলেন মিলিটারী ইউনিফর্ম। ( তা একদিকে ভাল। উকিল থেকে মক্কেলকে ধনে-প্রাণে মারার চেয়ে মিলিটারী হ'য়ে লোককে শুধু প্রাণে মারা মন্দের ভাল। ) একদল নিষ্কর্মা লোক জুটিয়ে সুরু করলেন কুচ-কাওয়াজ। মন্ত্রী মীর লায়েক আলি, তাঁর সম্বন্ধী মোইন নওয়াজ জঙ্গ আর তকী-উদ্- দীন তাঁর পিঠ চাপড়াতে লাগলেন।

কাশেম ভাল মানুষ নিজাম বাহাদুরকে 'ন তস্থৌ' অবস্থায় পেয়ে ভুজুং ভাজুং দিয়ে রাখলেন একেবারে হাতের মুঠোয়।…স্বপ্ন দেখতেন ফ্যুরার হ'য়েছেন হিটলারের মতো। হায়দ্রাবাদের অধিবাসী দু'কোটি হিন্দু-মুসলমান তাঁর ক্রীতদাস হ'য়েছে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্বের বাইশ কোটি টাকা তাঁর ট্যাঁকে উঠেছে। অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, "লড়্‌কে লেঙ্গে…"।

মহারাজ সার্ কিষণপ্রসাদ ও সার্ মির্জা ইস্‌মাইলের হাতে গড়া বর্তমান হায়দ্রাবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিষে অস্থির হ'য়ে উঠল। ব্যাকুল হ'য়ে উঠল মধ্যযুগীয় বর্বরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা লাভের জন্য প্রজা-সাধারণের আকুল আবেদন দিল্লীতে পৌঁছাল।

পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া ও মৌলানা আজাদ—চার মাথা এক হ'ল।

এদিকে কাশেমের মাথায় নতুন ফন্দি-ফিকির কি যেন খেল্‌ছে। দুষ্ট সরস্বতী ভর করলে যা হয়।

'এমন সময় হা রে···রে···রে···রে'।

ব্যাপারটা ঠাওর হবার আগেই সাঁড়াশির মধ্যে আট্‌কে পড়লেন কাশেম।

সাঁড়াশির এক মুখে চৌধুরী অন্য মুখে রুদ্র। ভারত-সরকারের দুই জাঁদরেল সেনানায়ক।

নিজাম আত্ম-সমর্পণ ক'রলেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ল। তাতে আঁকা অশোক-চক্র। যার অর্থ 'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু'।···

হায়দ্রাবাদে বহুকাল থেকে একটা গল্প প্রচলিত আছে।

নিজাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফ জাহ্ তখন যুবক। এক রাত্রে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিল্লীর অভিমুখে চলেছিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে তিনি পথে এক ফকিরের আস্তানায় আশ্রয়

নেন,—বারহান্‌পুর অথবা খুলদাবাদের কাছাকাছি কোন জায়গায়। ফকির নির্লোভ। সিদ্ধ পুরুষ। আসফ জাহ্‌ তাঁর কাছে কিছু খাদ্য প্রার্থনা ক'রলে ফকির তাঁকে গুটি দুই কুলিচা বা রুটি ও জল দেন। সে দু'টি তিনি খেয়ে ফেল্‌লে ফকির তাঁকে আরো কুলিচা দেন। একে একে সাতটি কুলিচা খেয়ে তাঁর পেট ভরে যায়। তিনি আর নিতে চান না। তখন ফকির তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে বলেন যে আল্লা-রসুলের অনুগ্রহে আসফ জাহ্‌ এক বিখ্যাত রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা হবেন এবং এই বংশে সাতজন রাজত্ব ক'রবেন।

সেই থেকে নিজামের ব্যক্তিগত পতাকায় প্রতীক চিহ্ন আঁকা রয়েছে এই কুলিচা। বর্তমান নিজাম ওসমান আলি খান হ'লেন সপ্তম নিজাম। ফকিরের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী দু'শ বছর পরে পূর্ণ হ'ল।

* * *

বর্তমানে ঐতিহ্যময় এই দুর্গটির মালিক আমরা—ভারত-যুক্ত-রাষ্ট্রের মহামান্য নাগরিকেরা। কেল্লা-টেল্লা হাতে আছে জান্‌লে আমাদের পোষমানা মধ্যবিত্ত রক্তও অকারণে তেতে ওঠে। লম্বা লম্বা পা ফেলে বল্‌তে ইচ্ছে ক'রে, 'I can shoot. I can kill'.

রাজাড়ে মেজাজ নিয়ে এগোলাম ভেরুল বা ইলোরা গুহার দিকে।

দৌলতাবাদ থেকে উত্তর দিকে মাইল দশেক রাস্তা। পাহাড় কেটে তৈরি সর্পিল পথ। একদিকে পাহাড়ের খাড়াই, অপর দিকে গভীর খাদ।

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'।

বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর হাতছানি এড়িয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। স্বল্প-পরিচিত সারথির উপর 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি' গোছের ভাব নিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রে রইলাম।···

## ॥ পাঁচ ॥

ছেলেবেলায় কোন এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় রূপকথা শুনেছিলাম।

'এক রাজপুত্র দেশ ভ্রমণে গেছেন। যেতে, যেতে, যেতে কত দেশ-দেশান্তর কত পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা পার হয়ে, কত রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে এক বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলেন।

বনে পাখ-পাখলীর শব্দ নেই, বাঘ-ভালুকের সাড়া নেই। জন-মানবের চিহ্ন নেই।

চল্‌তে চল্‌তে আরো অনেক দূর গিয়ে রাজপুত্র দেখেন বনের মধ্যে এক রাজপুরী। অমন সুন্দর রাজপুরী কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। দেখে তো রাজপুত্র অবাক।

রাজপুরীর ফটকের চূড়া যেন আকাশে ঠেকেছে। ফটকের দুয়ার রয়েছে বন জুড়ে। কিন্তু ফটকের তোরণে নহবত বাজে না। ভাট-বন্দী হাঁকে না।

দুয়ারে দুয়ারী বাধা দিল না। রাজপুত্র ধীরে ধীরে রাজপুরীর ভিতরে গেলেন।

পুরী যেন দুধে ধোয়া—এমনি ধব্‌ধব্‌ করছে। দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল-ঘড়া, পাঁচ-পল্লব ফুলের তোড়া। কিন্তু এমন বিশাল পুরীর মধ্যে জন-মানুষ নেই। পুরী নিভাঁজ নিঝুম।···

দেখেন মস্ত আঙিনা। আঙিনা জুড়ে হাতি ঘোড়া, সিপাই লস্কর, দ্বারপাল ঢাল-তরোয়াল-বর্শা নিয়ে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। কারো চোখে পলক পড়লো না, কেউ কথা কইলো না।

কেউ তাঁর দিকে ফিরে পর্যন্ত চাইল না। তিনি এগিয়ে গেলেন।

ঘরের পর ঘর পার হ'য়ে চল্‌লেন রাজপুত্র। এক কুঠ্‌রিতে দেখেন মস্ত রাজ-দরবার। সিংহাসনে রাজা বসে। রাজার মাথায় রাজছত্র হেলে আছে। দাসীর হাতে চামর ঢুলে আছে। মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, সৈন্যসামন্ত, গুরু-পুরোহিত, নর্তক-নর্তকী, দাস-দাসী যে যেখানে সে সেখানে ঠিক আছে। কিন্তু কারও চোখে পলক নেই কারও মুখে কথা নেই। সাড়া নেই, শব্দ নেই। সব নিসাড় নিঝুম।

সব পাথরের মূর্তি।

কবে এক মায়াবী দৈত্য রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে গম্‌গমা সোনার রাজ্যকে মরণ-ঘুমে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে গেছে।'

কিন্তু সে কবে?···

হাজার বছর আগে না মাত্র আজ সকালে?

মনে হ'ল, কান পাতলে এখনও বুঝি এই বিশাল পুরীর হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যাবে—এখনও তা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি।···

ইলোরা গুহায় প্রবেশ করে মনে হ'ল বুঝি সেই রূপকথার দেশে পৌঁছে গেছি। এতটুকু যেন প্রভেদ নেই কোথাও। সেই রূপকথা আজ বাস্তব হ'য়ে দেখা দিয়েছে।···

···ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে সেখানে, এমন সময় একজন এসে নিজেকে গাইড বলে পরিচয় দিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

সরকারী গাইড নয়। তিলক-ফোঁটা কাটা মহারাষ্ট্রী পূজারী ব্রাহ্মণের মতো চেহারা। মাথায় টুপি। ধুলো মাখা খালি পা।

দূর কোন গ্রাম থেকে পূজো-আচ্চা শেষ ক'রে বুঝি এসে দাঁড়াল।

আমরা ছাড়া আজ আর এখানে কোন দর্শকও নেই।

ইলোরায় ঠিক এই রকম অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য গাইড প্রত্যাশা করিনি।

মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল।

তাকে ভাগিয়ে দিতে চাইলাম আমরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সে গেল না। সঙ্গে লেগে রইল,—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুরের ছদ্মবেশে ধর্মের মতো।···

অচিরে উপলব্ধি ক'রলাম সেই ব্রাহ্মণ গাইড হিসেবে রত্নবিশেষ। সরকারী গাইডের মতো মাসের পয়লা তারিখের কথা ভাবতে ভাবতে মুখস্থ আওড়ে যায়না। শুঁড় ভাঙা গণেশমূর্তিকে দেবীমূর্তি বলে চালাতে চেষ্টা করেনা। আবার আগ্রার পেশাদার গাইডের মতো 'লুটস্ ইজ দি ঝাটস্' গোছেরও নয়। তাজমহলের হীরে-মুক্তো-চুনি-পান্না কি করে অন্তর্হিত হ'য়েছে বলতে গিয়ে বৈদিক ইংরেজীতে তারা বোঝাতে চায় যে, জাঠ দস্যুরা সব লুট ক'রে নিয়ে গেছে।

এই লোকটি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী ও সখের গাইড বলেই মূল্যবান। সে জানে, কোথায় কি আছে। মূর্তিগুলির কুলপঞ্জী তার নখদর্পণে। প্রাচীন শিল্পকলার ব্যাকরণও তার অগোচর নয়। সে আমাদের সব কিছুই দেখতে সাহায্য ক'রল—কোন কিছুই গায়ের জোরে দেখাতে চাইল না। সর্বোপরি রসবোধ বলে দুর্লভ জিনিসটি তার আছে। সে জানে কখন কথা বলা

দরকার, আর কোথায় নীরব থাকলেই ভাল।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব ও সোনার পাথরবাটির মতো অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা, কার্লে ও বাঘ-এর চৈত্য বিহার ও পূর্ণাঙ্গ মন্দিরগুলি গুহা নামে বিশ্রুত। কিন্তু এ গুলিকে যদি গুহা বল্‌তে হয় তাহলে আমরা দেউল প্রাসাদ বল্‌ব কাকে? এগুলি মসলা দিয়ে পাথরের টুকরো গেঁথে তৈরি হয়নি একথা সত্যি। এগুলি পাহাড়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার বাইরে ও ভিতরে খোদাই ক'রে। জলজ্যান্ত পাহাড় খোদাই করে হর্ম তোরণ, প্রাঙ্গণ, বারান্দা, দরজা, জানালা, চৌবাচ্ছা, সিঁড়ি, থাম, ছাদ, বেদী, দীপাধার, পশুপক্ষী, ফুল-লতা-পাতা—এমন কি বিশাল বিগ্রহগুলি পর্যন্ত, সমস্তই তৈরি হ'য়েছে তদানীন্তন শিল্প শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে।

বৌদ্ধদের বারো নম্বর এবং হিন্দুদের পনরো নম্বর গুহা দু'টি যথাক্রমে দোতালা ও তেতালা। সে দু'টির থাম আমাদের কোলকাতার সেনেট হাউসকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সেখানের মূর্তিগুলি শিল্প-প্রদর্শনীর মতো ক'রে সুন্দরভাবে সাজান। আর এমন ভাবে সাজান যাতে সবগুলির ওপর বাইরের আলো এসে পড়ে।

এক বারো নম্বর গুহাটিতেই আটচল্লিশটি স্তম্ভ ও আটানব্বইটি মূর্তি রয়েছে। এ ছাড়া দরজা, জানালা ও দেওয়ালের কারুকার্যে যে কত ছোট-বড় মূর্তি রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। অশ্বত্থ গাছ, হরিণ, সিংহ, হস্তী, হংস-মিথুন, পুষ্পার্ঘ্য হাতে তরুণী, নর্তকী,

অপ্সরা ; কি নেই ?

ইলোরায় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সওয়া মাইল জায়গা নিয়ে বিস্তৃত হ'য়ে রয়েছে গুহাগুলি। এখানে গুহা সবসুদ্ধ চৌত্রিশটি। দক্ষিণ দিকের বারোটি বৌদ্ধ যুগের। এগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে তৈরি। তার পাশেই—মাঝখানে সতরোটি গুহা ব্রাহ্মণ্য যুগের,—পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের। জৈনদের পাঁচটি গুহা কিছু তফাতে—উত্তর প্রান্তে ; নবম শতকের শেষ দিকের। এই তিন বিভিন্ন ধর্মাশ্রিত গুহাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধদের গুহাগুলি—উপাসনার জন্য চৈত্যগৃহ ও শ্রমণদের বাসের জন্য বিহারগুলি—সংসারের প্রপঞ্চ ও তন্‌হা পিছনে ফেলে আসা ঐহিক বিষয়ে উদাসীন অর্হতগণের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলির মধ্যে 'সূতর কি ঝোপরা' চৈত্যটিই শ্রেষ্ঠ। শান্ত পরিবেশের জন্য এটির সঙ্গে য়ুরোপীয় ক্যাথেড্রেলগুলির সাদৃশ্য আছে।

এই সঙ্ঘারামে একদিন শুধু তথাগতের বাণীকে পাথেয় ক'রে মহানিবৃত্তির পথে এগিয়ে চলা মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষাপাত্র ও কাষায় সম্বল ভিক্ষুদের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত,—

"মুঞ্চপুরে মুঞ্চ পচ্ছতো
মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্‌স পারগূ,
সব্বত্থ বিমুত্তমানসো
ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।"

…যা সম্মুখে আছে, ত্যাগ কর। যা পশ্চাতে আছে, ত্যাগ কর। যা মধ্যভাগে আছে, তাও ত্যাগ কর। ভবের পরতীরে চলে যাও। সমস্ত তৃষ্ণা ক্ষয় ক'রে—সর্বত্র বিমুক্ত চিত্ত হ'লে—আর জন্ম-জরার অধীন হ'য়ে দুঃখ ভোগ ক'রতে হবে না।

সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনার ধ্বনি উঠত,—

"…দিট্‌ঠা বা এ চ অদিট্‌ঠা
এ চ দূরে বসন্তি চ অবিদূরে
ভূতো বা সম্ভবেষী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতাত্তা…।"

দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য, নিকটের অথবা দূরের, অতীতের অথবা অনাগত ভবিষ্যতের সকলে—সকল প্রাণী—সুখী হোক।…

জৈনদের গুহাগুলির নির্মাণ কৌশলের মধ্যে কারিগরের অপরিসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় ও যত্নের পরিচয় আছে। নেই শুধু শিল্পীর নির্বিঘ্নতা ও ভাব-তন্ময়তা। মূর্তিগুলি কিছু স্থূল। সেগুলিতে জলুস থাকলেও জীবন নেই। সামঞ্জস্য ও সুষমা দুয়েরই অভাব চোখ এড়ায় না। রুচি ও পারিপাট্যের একটি বড় কথা ব্যালান্স বা সঙ্গতি। সেটা এখানে কম। ইলোরার ব্রাহ্মণ্য যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তুলনায় সেগুলি যেন তাজমহলের পাশে আমাদের রাজভবন।

একমাত্র ইন্দ্রসভাতে রূপদক্ষতার পরিচয় আছে। বৈদিক যুগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। বৈদিক ঋষিরা ইন্দ্রের প্রতিমা গড়েন নি, ধ্যান-কল্পনা দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের মূর্তি প্রথম গড়া হ'য়েছে

দেখতে পাই এই ইলোরা গুহায়।

ব্রাহ্মণ্য যুগের গুহাগুলির দিকে এগিয়ে গেলাম।...এই গুহাগুলি বা বিশাল এক পাহাড় খোদাই করা স্থাপত্যের মধ্যে দক্ষিণ দিকে শিব ও শক্তির উপাসকদের নানা বিগ্রহের প্রাধান্য এবং উত্তর দিক জুড়ে বৈষ্ণবদের উপাস্য দেব-দেবীর মূর্তি; একদিকে শিব, পার্বতী, দুর্গা বা ভবানী এবং কালিকাদেবী। অন্যদিকে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, দশ-অবতার, রামায়ণের উপাখ্যান, পৌরাণিক গল্প প্রভৃতি রূপায়িত হ'য়েছে। সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও সুষমায় এই মূর্তিগুলির সমকক্ষ মূর্তি পৃথিবীতে অল্পই আছে।

চোদ্দ নম্বর গুহার লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর। এটি এলিফ্যাণ্টা গুহার প্রখ্যাত 'ত্রিমূর্তি'র মতোই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে।

তক্ষণ-শিল্পে কালীর প্রাচীনতম মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় এই ইলোরার কৈলাস মন্দিরের নবম সংখ্যক গুহায়। কালী এখানে ভয় ও বরাভয়, ক্রান্তি ও শান্তির প্রতীক রূপে কল্পিতা নহেন। এখানে তিনি মহাকাল ভৈরবের শক্তি মৃত্যুরূপা মহাকালী। কঙ্কালসার মূর্তি।

রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে 'সীতা কি নাহানি'র সতরো সংখ্যক গুহায় লঙ্কেশ রাবণ কর্তৃক হর-পার্বতীসহ কৈলাস পর্বত উৎপাটনের চেষ্টার মতো নাটকীয় ও গতিশীল ভাস্কর্য ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই। মূর্তিগুলি রেখার বন্ধনে স্থির নয়—গতিপ্রাণতায় ভরপূর।

ইলোরার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হ'ল ভুবন-বিখ্যাত কৈলাস।

শুধু ইলোরা কেন গোটা ভারতবর্ষে ঠিক এই ধরনের মন্দির আর দ্বিতীয় নেই। এটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি পূর্ণশ্রী।

কৈলাসপতির মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে আমাদের মতো যে-কোন সাধারণ দর্শককে অভিভূত হতেই হবে। একটা গোটা পাহাড়কে মাটির ঢেলার মতো অবলীলাক্রমে কেটে তৈরি সে দেউল। একশ' ফীট উঁচু, দেড়শ' ফীট চওড়া, আড়াইশ' ফীট গভীর, পাঁচশ' ফীট তার পরিধি। আর কী তার কারুকায! ভাষায় বর্ণনা ক'রে তার কিছুই বোঝান যাবে না। পিয়ারে লোতির মতো বাগ্দেবীর অন্যতম বরপুত্র যার বর্ণনা দিতে গিয়ে হার মেনেছেন, 'সেথা আমি কি গাহিব গান ?'

দেখতে দেখতে শুধু মনে হ'য়েছে, একি মানুষের তৈরি ?··· এই আশ্চর্য শিল্প-সম্ভার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন যুগে যুগে অনেকেরই অন্তরে জেগেছে। তাই জনপ্রবাদ জন্ম নিয়েছে যে এক রাত্রের মধ্যে দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ ক'রেছেন।

ইতিহাসে দেখতে পাই, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মহান্ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসানে যে সমস্ত হিন্দুরাজত্বগুলি গড়ে ওঠে, তাদেরই উৎসাহে ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের সুবর্ণযুগ দেখা দেয়। ভারতের পশ্চিম ভূভাগ ও দক্ষিণ অঞ্চল খ্রীষ্টীয় ৭৫৩ শতক পর্যন্ত চালুক্য রাজবংশের অধীন ছিল। তারপর সে ভূখণ্ড রাষ্ট্রকূট-বংশীয় 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক' দন্তিদুর্গের পদানত হয়। ইলোরার কৈলাসনাথের অপূর্ব মন্দির মান্যখেট বা মালখেড়ের রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরাক্রান্ত রাজা, কীর্তিমান পুরুষ, 'শুভতুঙ্গ

অকালবর্ষ' প্রথম কৃষ্ণদেব ৭৫৭-৮৩ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে নির্মাণ করান। তিনি ছিলেন দন্তিদুর্গের খুল্লতাত।

কৈলাসের গাম্ভীর্যময় পরিকল্পনা ও ছন্দ-বৈভব, অনির্বচনীয় এবং অ-ধ্যেয় বস্তু ও ভাবকে রূপায়িত করার সার্থক প্রচেষ্টা, ভারত-শিল্পের অস্থূল প্রাণাশ্রয়ী লোকোত্তর শক্তির পরিচয় বহন ক'রে চলেছে কল্প হ'তে কল্পান্তরে। কোন্ সে অজ্ঞাত শিল্পীর দল যারা কঠিন পাথরের বুকে রচনা করেছে অভিনব মহাকাব্য ?... আমাদের আজকের নির্মাল্য অর্ঘ্য কি তাদের কাছে পৌঁছাবে ?...

আর একটি কথা বলে ইলোরার প্রসঙ্গ শেষ ক'রব।

শিল্পী লিয়োনার্ডো ছ ভিন্‌চি সখেদে বলেছেন, 'পরম সুন্দর আর চরম অসুন্দর, দুই-ই দুর্লভ। জগতে পাঁচ-পাঁচিরই ছড়াছড়ি'। হলফ ক'রে বল্‌তে পারি যে, ইলোরায় এলে ভদ্রলোকের সে আপসোস থাকত না। এখানের তক্ষণ শিল্পে সুসভ্য মানুষের শ্রেষ্ঠতম আবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও রূপদক্ষতা পরম সুন্দরকে যেমন প্রকাশ ক'রতে চেয়েছে, তেমনি যুগ-যুগান্তরের, বিশেষ ক'রে বর্তমান কালের মানুষের মনের চরম কদর্যতাও প্রকাশ পেয়েছে। যে সকল দর্শক গেছেন সেখানে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবীর সভ্য-সমাজের কাছে গর্ব করার মতো কোন কোন মূর্তির গায়ে ও গুহার দেওয়ালে নোংরা ছবি ও কথা লিখে রেখে এসেছেন।

এরা জানেনা এরা কি ক'রছে। ঈশ্বর এদের মার্জনা করুন। আমেন।

## ॥ ছয় ॥

সরাইখানার পাশেই রাওজা।...

রুক্ষ রিক্ত মাটির আধ হাত উঁচু একটি সমাধি।

আড়ম্বরহীন। আচ্ছাদনহীন।

সমাধির ঠিক মাঝখানে নিয়ত পরিচর্যায় সতেজ একটি তুলসীগাছ।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি সেই গৈরিক ধূলি-শয্যার দিকে চেয়ে।...

না। কোন ভক্ত বৈষ্ণব, সাধু-সন্ত-অবধূতের মঠ বা সমাধি নয়। কোন ফকিরের দরগাও নয়। একজন দরজীর কবর।

হ্যাঁ, দরজী ছাড়া আর কি? পেশা যখন সৌচিকের।

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,...বার্ধক্যে ন্যুব্জ দেহ শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত দীর্ঘ শীর্ণ এক বৃদ্ধ।...উন্নতনাসা। গৌরকান্তি। ভ্রূকুটি-কুটিল প্রশস্ত ললাট। চিবুকে বজ্রের কাঠিন্য। চোখে শ্যেন পক্ষীর মতো সতর্ক দৃষ্টি।... পিছন দিকে রাখা হাত দু'টিতে স্ফটিকের জপমালা, কুরান শরীফ ও একখানি রত্নখচিত তরবারি।...

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিখানি।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, ভারতবর্ষের—এশিয়ার—মুসলমান নরপতিদের প্রায় প্রত্যেকের এক একটি ব্যক্তিগত পেশা ছিল।

আলতামাশের পুত্র নাসির-উদ্-দীন মুহম্মদ শাহের হাতের লেখা ছিল সুন্দর এবং পেশা ছিল পুঁথি নকল করা। এই পুঁথি—বর্তমান নিজাম বাহাদুরের লেখা প্রেম-কাব্যগ্রন্থের মতোই—ওমরাহদের কাছে চড়া দামে বিক্রি ক'রে সুলতান বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নিয়েছিলেন।

আলমগীর বাদশাহ্ গাজী অগ্রজ দারা শুকোহ'র মতো দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় বৃথা কালহরণ করেন নি। চিরকাল হাতিয়ার ধরে এসেছেন আর অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদন ক'রেছেন সূচি-শিল্পে। চমৎকার টুপি তৈরি ক'রতেন বাদশা। খুসরোজ বা নওরোজের মেলায় সেই টুপি বাজার দরে বিক্রি ক'রে সম্রাট্ কিছু টাকা জমিয়ে ছিলেন। তাঁর শেষকৃত্যের খরচ, তাঁরই নির্দেশক্রমে, এই দরজীর কাজ করা স্বোপার্জিত অর্থে হ'য়েছিল।

"...চার টাকা দু'আনা," নিজের শেষ ওয়াশিয়তনামায় লিখেছিলেন সম্রাট্, "টুপি তৈরি ক'রে উপার্জন করা এই অর্থ মহলদার আলিবেগের কাছে আমি গচ্ছিত রেখেছি। এই সম্বলহীন সামান্য লোকটার কফিনের কাপড় কিনো তা দিয়ে।... আর আমার থলিতে রইলো তিনশ' পাঁচ টাকা। পবিত্র কুরান নকল ক'রে এগুলি আমি মজুরি পেয়েছিলুম। আমার মৃত্যুর পর এই টাকা ফকিরদের মধ্যে বিলিয়ে দিও।...'

"খালি মাথায় মাটি দিও এই লোকটাকে, যে সত্যপথ-ভ্রষ্ট হ'য়ে বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিয়ামতের দিন, নগ্ন-শিরের

দীনতা নিয়ে এই মহাপাতকী দীন-দুনিয়ার-মালিকের কাছে হাজির হ'লে হয়ত তাঁর করুণা উদ্রেক ক'রতে পারবে।'

"...মোটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকো আমার কবর। চাঁদোয়া নয়। সঙ্গীত নয়।..."

তাঁর গুরু ফকির বারহান্-উদ্-দীনের সমাধির পাশে তাঁর এই কবর। কাছেই সম্রাটের পুত্র শাহ্‌জাদা আজম শাহ্ এবং তাঁর বেগমের অন্তিম-শয্যা। আর একটু দূরেই বাদশার অন্যতমা বেগম রবিয়া-দুরানির সমাধি। 'বিবি-কা-মক্‌বারা'। তাজমহলের অক্ষম অনুকরণ।

এই দীনতায় সম্রাট্ তাঁর কবি-ভগ্নী জাহান্-আরা বেগমকেও ছাড়িয়ে গেছেন।...

প্রাচীন মিসরের ফ্যারাওদের পিরামিড থেকে সুরু ক'রে সে যুগে রাজা-বাদশা, আমীর-ওমর অনেকেই স্থান নির্বাচন করে নিজের কবর নিজেই তৈরি ক'রে যেতেন। লেখার হাত থাকলে অনেকেই কবরের জন্য কাব্য রচনা ক'রে যেতেন। কেউ কেউ পেশাদার লিখিয়েদের দিয়েও দু'কলম লিখিয়ে নিতেন। এই ধারা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উনবিংশ শতকেও মহাকবি শ্রীমধুসূদন নিজের সমাধি ফলক রচনা ক'রেছিলেন। কৈফিয়ত স্বরূপ তিনি নাকি বলেছিলেন, "When I am digging my own grave, why shall I not write my epitaph too?"

সম্রাট্ শাহ্-জাহানের 'নয়ন-পুত্তলি' জাহান্-আরার কবি-

প্রতিভা ছিল। নিজের অতি সাধারণ সমাধির জন্য তিনি একটি ছোট্ট ও সুন্দর কবিতা লিখে গেছেন,—

"বেগায়র সব্জা না পোশাদ কসে মাজারে মারা।
কে কবর পোসে গরিবান্ হামিন্ হিয়াহ বসন্ত্॥"

কিন্তু তাঁর সহোদর আওরঙ্গজেব ছিলেন কাজের লোক। ও সব সঙ্গীত-কাব্য-টাব্য তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাই কোন দিল্-চশ্পি বয়েৎ লিখে রাখেননি নিজের কবরের জন্যে। অনাড়ম্বর কবরটিই হয়ত ভবিষ্যতে কোন শক্তিমান কবিকে প্রেরণা দেবে অনবদ্য কাব্য রচনায়। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

ব্রিটিশ সরকার অবশ্য আওরঙ্গজেবের বিবর্ণ সমাধির আশপাশ মর্মরমণ্ডিত ক'রে আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু ভৃগুপদচিহ্নের মতো, 'জিন্দা-পীর' আলমগীরের বুকের উপর এই আদি ও অকৃত্রিম তুলসী গাছের রহস্যের কোন সূত্রই খুঁজে পেলাম না। এটিও নাকি সম্রাটের শেষ ইচ্ছা ছিল।

## ॥ সাত ॥

একটি শবাধারকে ধীরে ধীরে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে চারজন লোক।···

পিছনে নত মস্তকে চলেছে অসংখ্য মানুষ। ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বাল-বৃদ্ধ—কেউ বাদ নেই।

হিন্দু, মুসলমান, পারসীক, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ···সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিয়েছে এই বিরাট্ শোকযাত্রায়।

কেউ নীরবে হাঁটছে। কেউ বুক চাপড়ে কাঁদছে।···

এত বড় শোকযাত্রা বড় একটা দেখা যায় না।

রক্তিম পূর্ব আকাশ।

তখনও ভাল ক'রে সকাল হয়নি। শোক-যাত্রীদের পা শিশিরে ভিজে যাচ্ছে।

একে একে দিল্লীর সমস্ত প্রধান রাজপথ অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলেছে শবাধার। ক্রমে ক্রমে লোকও বাড়ছে এই মিছিলে।

পথিপার্শ্বে জনতার ভিড়। গবাক্ষপথে পুরনারীদের কুতূহলী চোখ।

মিছিল এগিয়েই চলেছে।···

ভোরের নামাজ শেষ ক'রে রোজকার মতো অত প্রত্যুষেও 'ঝরোখা-দরশন্'এ বসেছেন বৃদ্ধ বাদশা।

বাদশা আলমগীর।

প্রাসাদ-অলিন্দের এইখানে বসে রোজ তিনি দর্শন দেন প্রজা-সাধারণকে। দেখেন তাদের আরজি, শোনেন তাদের অভাব অভিযোগ। কাউকে বলেন, 'হাথী পাও'। কাউকে বলেন, 'হাথা পাঁও'।

কেউ হাতি বক্শিশ পায়, কেউ হাতির পায়ের তলায় জীবন হারায়।

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

"অল্লাহ্", শবাধারের দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই মুখ দিয়ে বার হ'য়ে এল একটি শোকসূচক প্রার্থনা, "অল্লাহ্"।

"কার রূহ্ কবজ থেকে মুক্তি পেল ?···কে সেই খুশ-নসিব যার মৃত্যুতে আবালবৃদ্ধবনিতার এই শোক-সমারোহ?"—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন বাদশা।

দেওয়ান বক্শী উজীর নগরপাল কোটাল সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রলেন।

কারো মালুম নেই।

"কোন ধনী শ্রেষ্ঠী হবে···"—মাথা চুল্‌কে বল্‌তে গেলেন উজীর।

অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে কথা বলে যে হনুমান তাদের উপর সম্রাট্ হাড়ে চটা।

ধমক দিয়ে হুকুম ক'রলেন,—"ইত্তিলা করো"। খবর নাও।

পাঁচ সাত জন ছুটে গেল সংবাদ আনতে।

তারা ফিরে এল মিছিলের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে।

"কী ব্যাপার ?"

"কে মারা গেল ?"

কারো মুখে 'রা' নেই।

শেষকালে একজন মুরুব্বী গোছের লোক করজোড়ে জানাল যে যদি তাকে অভয় দেন দুনিয়ার মালিক তবে সে পেশ ক'রতে পারে।

"কী এমন কথা ? বল। অভয় দিলাম।"

"খোদাবন্দ্ ফতোয়া দিয়েছেন সাম্রাজ্যে সঙ্গীত বন্ধ ক'রতে। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত কোনটাই চলবে না। আপনার হুকুমে প্রাণদণ্ড হ'য়ে গেছে সঙ্গীত সাহিত্য নৃত্য ও চারুশিল্পের।...তাই আমরা...সঙ্গীত ও সুকুমার কলার অনুরাগীরা...তার শবদেহ নিয়ে সৎকার ক'রতে চলেছি।...বান্দার গোস্তাকি মাফ করুন মেহেরবান।"

"বেশ ক'রছ। অতি উত্তম আয়োজন।" গোঁফ-দাড়ির অরণ্যে একটি অবাধ্য হাসির ঝিলিক্‌কে নির্বাসিত ক'রে বল্লেন সম্রাট্, "তবে দেখো, মুর্দাটিকে মাটির অনেকখানি নীচে কবর দিতে ভুলো না। কোনদিন তার কোন আওয়াজ, কোন ক্রন্দন দুনিয়ার ওপর ভেসে এসে মানুষের কাজে যেন বিঘ্ন না ঘটায়।"

## ॥ আট ॥

মুঘল সম্রাটদের ছায়া-মিছিল।…

মনে পড়ছে সুদূর ফরগণা গ্রামের একটি ছেলেকে। ছেলেটি যেমন মুখচোরা তেমনি ভীতু। ভয় বনের বাঘ আর মাদ্রাসার মৌলবীকে নয়। তাদের সে থোড়াই পরোয়া করে। ভয় বোরকা ঢাকা এক একফোঁটা মেয়েকে।

বউকে।

বউয়ের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা হ'লেই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে অজানা আশঙ্কায়। শ্বশুর বাড়ি যাবার নামে গায়ে জ্বর আসে। তার মা বকে-ঝকে মেরে-ধরে মাসে একবার শ্বশুরবাড়ি পাঠান। পাঁচনগেলা মুখ ক'রে যেতেও হয়। তবু ভয় কাটেনি কোনদিন।

আত্মজীবনীতে একথা লিখে গেছেন জহির-উদ্-দীন মুহম্মদ বাবুর। বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিলেন তিনি। তাঁর ধমনীতে তুর্কী তৈমুর ও মোঙ্গল চেঙ্গিজ খাঁর রক্ত প্রবাহিত। নিজেও তিনি অসাধারণ যোদ্ধা।

বারো বছর বয়সের পর লেখাপড়ার সুযোগ পেলেন না। বেরুতে হ'ল ভাগ্য অন্বেষণে। তবু সে যুগের তুর্কী ও পারস্য সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ আয়ত্ব ক'রেছিলেন তিনি। তুর্কীভাষায়

লেখা আত্মজীবনী ও কাব্যগ্রন্থ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সাক্ষর বহন ক'রছে।

হিন্দুস্থানকে বাবুর চিরকাল প্রবাসের কর্মক্ষেত্র মনে ক'রেছেন। সৌভাগ্যের উচ্চশিখরেও তাঁর মন কেমন ক'রত জন্মভূমি ফরগণার জন্যে।

মৃত্যুশয্যায় বাবুর হুমায়ুনকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ক'রে গেলেন। কাছে ডেকে মিনতি ক'রলেন, 'ভাইরা অকৃতজ্ঞ আচরণ ক'রলেও তাদের ক্ষমা ক'রো'।

হুমায়ুন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রেছিলেন।

নাসির-উদ্-দীন মুহম্মদ হুমায়ুন সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য ক'রেছেন, 'যেখানেই অনিবার্য পতনের সম্ভাবনা, সেখানেই পাওয়া যাবে হুমায়ুনকে।' আর একজন বলেছেন যে সারাজীবন তিনি হোঁচট খেয়ে কাটিয়েছেন আর এমনি এক হোঁচট খেয়েই তিনি দুনিয়া থেকেই বেরিয়ে গেলেন।

কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে সন্দেহ নেই। তবু মনে হয় রাজপুত রানী কর্ণদেবীর 'রাখিবন্ধ ভাই' হুমায়ুনের সমাধির উপর এই স্মৃতি ফলক লিখ্‌লে অবিচার করা হবে।

বাবুরের অধীনে তিনি অসমসাহস ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন। তবে যখনই একা কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে তখনই তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছেন হ্যামলেটের মতো। "To be or not to be." অর্বাচীনদের এ সমস্যা হয় না। এ বিপদ পণ্ডিত মানুষের।

"the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought
And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action."

সেক্সপীয়রের হয়ত এই মুঘল সম্রাটের কথা মনে পড়েছিল যখন, চল্লিশ বছর পরে, তিনি তাঁর অপূর্ব বিয়োগান্ত নাটকে, পারিপার্শ্বিকের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া, সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি সম্পন্ন দার্শনিক এক নায়কের চরিত্র চিত্রণ ক'রতে বসেছিলেন।

কূট রাজনীতিজ্ঞ জালাল-উদ্-দীন মুহম্মদ আকবর ছিলেন সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীতের অনুরাগী। তাঁর উৎসাহে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টায় ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত যৌবন লাভ করেছিল। দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীকে নিয়ে নব নবরত্ন গড়ে তুলেছিলেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে গুণীর সমাদর ক'রতেন তিনি। সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে তিনি ইবাদৎখানা নির্মাণ করিয়েছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে। প্রচার ক'রেছিলেন নূতন ধর্ম 'দীন ইলাহী'।

ফতেপুর সিক্রিতে আকবর 'বুলন্দ্-দরওয়াজা' নামে এক বিজয়-তোরণ নির্মাণ করিয়ে তার উপর লিখিয়েছেন, "মরিয়মের পুত্র যীশু ব'লেছেন, এই জগৎ একটি সাঁকো মাত্র। এর উপর দিয়ে পার হ'য়ে যাও, কিন্তু এর উপর বাস করার বাসনা করোনা।"

কথাগুলি যীশুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর মতো শোনালেও

ম্যাথু, মার্ক, লুক্, জন্ কিংবা পীটার অথবা পল্'এর লেখা কোন সুসমাচারের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও পাওয়া গেল না। তবে কি এটি আকবরের স্বরচিত খ্রীষ্ট-বাণী? যীশুর বেনামিতে তাঁর নিজের জীবন-দর্শন?...

নুর-উদ্-দীন মুহম্মদ জাঁহাগীর ছিলেন সুরা ও সুন্দরীর সাচ্চা সমঝদার। পাকা জহুরী। তিনি রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে বসরাই গোলাপের মাঝে দিন কাটাতেন। বল্‌তেন, "আধসের মাংস, এক সের সিরাজী ও এক ঝাঁক সুন্দরী—এর বেশী কিছু কাম্য নেই আমার।"

স্বর্ণপদকে পানপত্র হাতে তাঁর ছবি থাকত। সবচেয়ে দামী 'আশরফি'র নাম ছিল 'নূরজাহানী'। মোহরে ছাপা হ'ত, "বাদশাহ্ জাঁহাগীরের আদেশে জগতের আলো রানী বেগম নূর-জাহান-এর নাম বুকে নিয়ে কাঞ্চনের দীপ্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হ'য়েছে।"

শাহ্-জাহান ছিলেন শিল্প-কলার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ ও তাজমহল তাঁর অমর কীর্তি।

দামী পাথর ছিল তাঁর কলিজার চেয়েও প্রিয়। দেশে যখন দুর্ভিক্ষের হাহাকার তখন দু'কোটি টাকা মূল্যের পাথরে তখনঙ্গ-বিন্যাস করে তিনি ময়ূর সিংহাসনে বসে থাকতেন কার্তিক "Toজে। মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে আতর মাখা দাড়িতে হাত বোলাতেন বিপদ।র মৃগনাভি দেওয়া অম্বুরি তামাক টান্‌তেন রত্নখচিত ফরসি

গোলাপজলে ভরে।

শোনা যায়, বৃদ্ধ বয়সে বন্দী-দশায় দারার ছিন্নমুণ্ডের সংবাদেও তিনি ততটা বিচলিত হন্‌নি, যতখানি উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলেন দামী পাথরগুলো সন্তান আওরঙ্গজেব ছিনিয়ে নিতে পারে এই আশঙ্কায়।···

আওরঙ্গজের হ'লেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ কারো ধার দিয়েই গেলেন না। তিনিই তাঁর মাত্র উপমা কেবল।

তিনি গোঁড়া মুসলমান। যাকে বলে কট্টর। বিলাস-ব্যসন হারাম তাঁর চোখে। সুরা-সঙ্গীত-সুন্দরী ইবলিশের ছলনা মাত্র।

মিতাহারী। মিতব্যয়ী। দানহীনের মতো তাঁর বেশভূষা।

সবকিছু বর্জন ক'রে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন কুরান শরীফ আর মসনদ। পরকাল আর ইহকাল। দু'নৌকোয় পা। দু'টোকে পাওয়ার লোভে দু'টোকেই হারানো।···

১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। ভগ্নী জাহাম্-আরাকে দেখতে আগ্রায় এলেন। জাহান্-আরা আগুনে পুড়ে গিয়ে তখন খুবই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়।

আওরঙ্গজেব আসার সপ্তাহ তিনেকে পরে সম্রাট্ শাহ্-জাহান তাঁকে বরখাস্ত ক'রে দেন গবর্ণরের পদ থেকে এবং তাঁর পদবী ও জায়গির বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। শোনা গেল, সম্রাটের পুত্র ও একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হ'য়েও আওরঙ্গজেব সামান্য ফকিরের মতো জীবন যাপন করেন, এতে তাঁর অযোগ্যতাই

প্রমাণিত হ'য়েছে বিলাসী সম্রাটের চোখে। তাই এই শাস্তি।

এর আসল কারণ নাকি শাহ্জাদা দারা গুজগুজ ফুসফুস ক'রে বাপের কান ভারী ক'রে দিয়েছিলেন।

এই কলকাঠি নাড়ার জন্যে আওরঙ্গজেব দারাকে কোনদিন ক্ষমা ক'রতে পারেন নি।

ছ'মাস আওরঙ্গজেব বেকার-জীবন কাটালেন। জাহান্-আরা সুস্থ হ'য়ে উঠে ভাইয়ের হ'য়ে দরবার করেন বাপের কাছে। তাতেই পূর্বের পদমর্যাদা ফিরে পান আওরঙ্গজেব।

সাদা আর কালো। ভাল আর মন্দ। দু'টোই অধিক পরিমাণে ছিল আওরঙ্গজেবের অন্তরে। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রতে পারতেন তিনি। দিনে রাত্রে মাত্র তিন ঘণ্টা বিশ্রাম ছাড়া শুধু কাজ আর কাজ। প্রজাদের সবগুলি দরখাস্ত তিনি স্বয়ং পড়ে দেখতেন, নিজের হাতে সমস্ত হুকুম লিখতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা আর সমরনায়কদের কাছে খুঁটিনাটি সকল নির্দেশ তিনি নিজের হাতে লিপিবদ্ধ ক'রতেন। নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি ছিল তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। ব্যবহারিক জীবনে তাঁর মতো ধুরন্ধর দিল্লীর সিংহাসনে আর কেউ বসেন নি।

তিনি আবাল্য যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি অসমসাহসী।

তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোল। এই বয়সেই তিনি একবার অদ্ভুত সাহসের ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

আগ্রার কেল্লার বাইরে হাতির লড়াই হ'চ্ছে।...

পাহাড়ের মতো দু'টো হাতি লড়ছে।

আগে থাকতেই তাদের পিপে পিপে ধান্যেশ্বরী গিলিয়ে মত্ত ক'রে রাখা হয়েছে।

সেপাই সান্ত্রী গিস্‌গিস্‌ করছে। অসংখ্য লোক ভিড় করে মজা দেখছে।

জমে উঠেছে তামাশা।

এমন সময় শুভকর নামে হাতিটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে কাবু ক'রেই পাগল হ'য়ে উঠে কাছেই অশ্বারূঢ় শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের দিকে তেড়ে এল।...

পাগ্‌লা হাতি দেখে যে যেদিকে পারল ছুটতে আরম্ভ ক'রল। কিন্তু অবিচলিত রইলেন এক মাত্র শাহ্‌জাদা।

বীর-কুঞ্জর তিনি।

নিমেষে একটি বর্ষাফলকে বিদ্ধ করলেন দ্বিরদটির কপাল। গর্জন ক'রে হাতিটি তাঁর ঘোড়ার পাশে দু'টি দাঁত দিয়ে চেপে ধরল তাকে মাটিতে। তার আগেই কিন্তু শাহ্‌জাদা লাফিয়ে পড়েছেন বিদ্যুদ্‌বেগে। ততক্ষণে পরাজিত হাতিটি ফিরে এসে শুভকরকে আবার আক্রমণ করেছে।...

আওরঙ্গজেব দাঁড়িয়ে তাদের লড়াই দেখতে লাগলেন প্রশান্ত বদনে।

এই অসীম সাহস তাঁর আজীবন বজায় ছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্বের মধ্যে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্তাল তরঙ্গের মাঝে, বহু মত্তহস্তীর সঙ্গে মোকাবিলায়, তিনি স্থির থেকেছেন। একটি কেশাগ্রও তাঁর বিচলিত হয়নি।

অভাব ছিল তাঁর প্রজাদের প্রতি সমদৃষ্টির। অভাব ছিল উদারতার, বিশ্বাসের, করুণার ও কল্পনার। সম্রাটের পক্ষে যে গুণগুলি অপরিহার্য। সকলে তাঁকে ভয় ক'রেছে—ভালবাসেনি কেউ। তাই সম্রাট্ হয়েও তিনি কৃপার পাত্র।

একবার ছাড়া তাঁর চোখে জল দেখেনি কেউ।

মাত্র একবার।

ভাইদের হত্যা করে, বৃদ্ধ জরা-জীর্ণ পিতাকে অপমানিত করে, পুত্রদের কারারুদ্ধ ক'রে, স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুতে যিনি এক বিন্দু অশ্রুপাত করেন নি, তিনিই একবার উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে ভেঙে পড়েছিলেন।

প্রতীক্ষাহীন, আগ্রহহীন, আকুলতাহীন আওরঙ্গজেবের চোখে জল?

কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্?

প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

কথাটা বিশ্বাস হ'চ্ছে না? না হবার কথাই।

কিন্তু অতনু কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। রেয়াত করেনি তাঁকেও। যিনি সমরক্ষেত্রে কোন অস্ত্রকেই গ্রাহ্য করতেন না, তিনি কাবু হ'য়ে পড়লেন পুষ্পধন্বার ফুলশরে।

মান মর্যাদা মায় মক্কা যাবার মহৎ সঙ্কল্প পর্যন্ত লুটিয়ে দিয়েছিলেন এক নটীর রাঙা পায়।

বুড়ো বিশ্বামিত্র দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব তো সেদিনের ছোকরা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

'মসির-উল্-উম্‌রা' গ্রন্থে এই কাহিনী লেখা আছে।

আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। একবার মাসির বাড়ি বেড়াতে গেলেন। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর আয়োজন হ'য়েছে।...

ফুলে-ফলে ভরা বাগিচায় বেড়াতে বেড়াতে শাহজাদার দৃষ্টি পড়ল রক্তপ্রবালের ন্যায় অধরদ্যুতিসম্পন্না চম্পকবরণী দীর্ঘাঙ্গী লাস্যময়ী এক ললনার প্রতি।

সামনা সামনি হতেও সে শাহ্‌জাদাকে কুর্নিশ করা দূরে থাক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফল তুল্‌তে লাগল গাছ থেকে।

এই দৃশ্যেই কাবু হ'য়ে পড়লেন শাহ্‌জাদা। নারী-বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব।...

সত্য-ত্রেতায় অনঙ্গ অঙ্গ ধরে ফিরতেন। 'প্রেম-পিরিত' সোজা জিনিস ছিল না। অনেকে কাঠখড় পোড়াতে হ'ত এর জন্যে।

সেই কখন মলয় পবন বইবে, চাঁদ উঠবে, গাছে ফুল ফুটবে, কোকিল কূজন ক'রবে, ভ্রমর গুঞ্জন তুল্‌বে, পাপিয়া 'পিয়া' 'পিয়া' ক'রে ডাক ছাড়বে, পুঞ্জ পুঞ্জ লবঙ্গকেশর সৌরভ ছড়িয়ে বাতাসে উড়ে যাবে, তবে হবে প্রেমের দরিয়ায় ঝম্প প্রদান। তার আগে কিচ্ছুটি করবার যো ছিল না।

দ্বাপর-কলিতে অবশ্য প্রেমের পথ সোজা হ'য়ে গিয়েছে। সোজা ক'রে দিয়েছেন শিবঠাকুর।

রাজা শান্তনু যমুনার জলে নৌকোয় জেলের মেয়েকে মাছ ধরতে দেখে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রলেন। ধোপার মেয়েকে ঘাটে কাপড় কাচ্‌তে দেখে বড়ু চণ্ডীদাস 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম' বলে গান ধরে দিলেন। দুর্ধর্ষ আওরঙ্গজেব, যিনি কোন এক দুর্ভেদ্য বর্মে হৃদয়বৃত্তিকে এতকাল ঢেকে রেখেছিলেন, তন্বঙ্গী নটীকে ফল পাড়তে দেখে আত্মহারা হলেন।

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী ?
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

...বিজয়িনীর নাম হীরা বাঈ।

আওরঙ্গজেবের মাসির হারেমের একজন সুকণ্ঠী গায়িকা। যৌবনবতী ক্ষণপ্রণয়িনীপ্রমদা। প্রেম যার কাছে পণ্য মাত্র।

তারই প্রেমে দেওয়ানা হ'য়ে উঠলেন শাহ্‌জাদা।

মাসির কাছ থেকে, লজ্জার মাথা খেয়ে, তাকে ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। ভুলে থাকলেন রাজকার্য। অবহেলা ক'রলেন রোজকার নামাজে।

একদিন হীরা বাঈ তুলে দিল তাঁর হাতে মদের পেয়ালা। যেমন ক'রে স্বর্গোদ্যানে আদমের হাতে ইভ তুলে দিয়েছিল নিষিদ্ধ ফল।

ইসলামের চোখে মদ হারাম। কিন্তু প্রিয়তমার অনুরোধ ঠেলেন কি ক'রে ?...আবাল্যের সংস্কার ভস্ম হ'য়ে গেল কটাক্ষের বহ্নিতে। ভামিনীর ভ্রূভঙ্গ-বিলাসে। বিবেকের অঙ্কুশ অগ্রাহ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত সেই উত্তপ্ত ফেনিল মদিরা, প্রিয়তমার

বিম্বাধরের মতোই রঙীন ও চিত্তবিভ্রমকারী আসব, পান ক'রতে উদ্যত হলেন তিনি।

ঠোঁটের কাছে পান পাত্রটিকে তুলেছেন, এমন সময় খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে পাত্রটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল হীরা বাঈ। কাঁচের পাত্রটিও হাসিতে ভেঙে পড়ল কুটি কুটি হ'য়ে।

"আমাকে মার্জনা করুন শাহ্‌জাদা", নতজানু হ'য়ে সেলাম ক'রে বিলাসিনী নর্তকী বল্‌ল, "আমি শুধু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে কতখানি ভালবাসেন। এই নোংরা সিরাজী দিয়ে আপনার মুখ তেতো ক'রে দিতে চাইনি।"...

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মানুষ যা কামনা করে, আগলে রাখতে চায় সমস্ত অন্তর দিয়ে তাই-ই হারিয়ে যায়।

হীরা বাঈও হারিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে।

হাহাকার ক'রে উঠল আওরঙ্গজেবের বজ্রকঠিন হৃদয়। দু'চোখ ছাপিয়ে নামল অশ্রুর বন্যা।...

সেই প্রথম। সেই শেষ।

## ॥ নয় ॥

দ্বাপরে 'দীপ্ত-বহ্নি-শিখা-সম' এক নারী বেণী উন্মোচন ক'রেছিলেন।

অবমাননাকারীর বক্ষরক্ত ছাড়া তিনি ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুন্তল বাঁধবেন না—এই তাঁর পণ।

তিনি 'বাসুদেব-প্রিয়সখী; পাণ্ডুরাজস্নুষা।···ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী'।

যাজ্ঞসেনীর অভিলাষ পূর্ণ ক'রেছিলেন হিড়িম্বা-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীবৃকোদর।...

কলিকালে উন্মুক্ত করবালের ন্যায় দীপ্যমান এক পুরুষ উষ্ণীষ ত্যাগ ক'রলেন।

তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছে যে তার ছিন্নমুণ্ড দর্শন না ক'রে তুষার-শুভ্রশিরে মুকুট পরবেন না,—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

তিনি বাবুর-কুল-তিলক; দিল্লীর অধীশ্বর।···জম্বুদ্বীপে অপার সৌভাগ্যবান পুরুষ।

চাঘ্‌তাই তুর্ক সম্রাটের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রেছিলেন জনাব মুকর্‌রবখান।···প্রসাদ-ভোজী এক মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ।...

বাপ্‌কা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া।
নহি কুছ তো থোড়া থোড়া॥

মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে আসীন হ'য়ে মুঘল-ত্রাস শম্ভুজী একের পর এক গড় অধিকার ক'রতে লাগলেন।

দাক্ষিণাত্যের কানন পর্বত প্রান্তর জনপদ শম্ভুজীর অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠল।...সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল তাঁর উদ্যত বর্শাফলক। তাঁর মশালের আগুন আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে দিল।...

হাবশীদের জাঞ্জিরা, চাওল ও পর্তুগীজ অধিকৃত ফোণ্ডা ও ও গোয়ার দুর্গ সমভূমি হ'য়ে গেল।...দিকে দিকে উড়ল মহারাষ্ট্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী।...

তাঁর রণ-নিনাদে ও বিজয়-উল্লাসে দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে বাদশাহ্ আলমগীরের নির্ধারিত মাত্র তিন ঘণ্টার বিশ্রামেরও অবকাশ রইল না।...

শিবাজীর কাল হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন বাদশা।... সেদিনের কথা মনে হ'লে আজও তাঁর সারাদেহে কে যেন মুঠো মুঠো জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে দেয়। সে অপমানের তীব্র দহন-জ্বালা এতদিন পরেও ভুলতে পারেননি তিনি।

তিনি তখন শাহ্জাদা। দাক্ষিণাত্যের সম্রাটের প্রতিনিধি। পিতা শাহ্-জাহান আগ্রায় অসুস্থ। কাফের দারার দুর্বল হাত থেকে তিনি রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেবার সঙ্কল্প ক'রেছিলেন শুধু ইস্‌লামের মুখ চেয়ে। ধূর্ত শিবাজী হয়ত গোপনে সম্রাটকে সাহায্য ক'রতে পারেন এই আশঙ্কা ক'রে তিনি অবিলম্বে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ ক'রেছিলেন। দূতের হাতে পত্র দিয়ে শিবাজীকে

সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে আগ্রা অভিযানে সহায়তা ক'রতে। বিনিময়ে প্রভূত ঐশ্বর্য ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গোঁয়ার শিবাজী তাঁর দূতকে কি ভাবে অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন ?···সে অভ্যর্থনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি অভিনব।···তাঁর প্রস্তাব শুনে শিবাজী দূত অবধ্য বলে তাকে হত্যা করেন নি সত্য তবে তাঁর আদেশে মারাঠারা তাঁর চিঠিটি—তাঁর স্বহস্তে লেখা পত্রটি—একটি কুকুরের লেজে বেঁধে তাকে ও তাঁর দূতকে শিবাজীর সমুখ থেকে তাড়িয়ে রাজ্যের সীমানা পার ক'রে দিয়েছিল।...

সামান্য একজন জায়গিরদারের স্পর্ধা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়েছিলেন। মনে পড়ে সেদিন বিনিদ্র রজনীতে দৌলতবাদের প্রাসাদ-শিখরে অস্থিরভাবে পদচারণা ক'রে তিনি উপায় খুঁজেছিলেন প্রতিহিংসার।...

দুশমন শিবাজীর মৃত্যুতে তিনি ভেবেছিলেন, খোদা মেহেরবান। পথের কণ্টক দূর হ'য়েছে। কিন্তু এ যে শয্যা-কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াল।

পার্বত্য-মূষিকের বাচ্ছাটাকে কচুকাটা করতে না পারলে আর শান্তি নেই।

উষ্ণীষ খুলে রেখে তিনি কঠিন প্রতিজ্ঞা নিলেন। যেমন ক'রে হোক ধ্বংস ক'রতে হবে শম্ভুজীকে। অধিকার ক'রতে হবে কোঙ্কণ।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রলেন শম্ভুজীর বিরুদ্ধে। ঘোষণা করলেন জিহাদ।

তবু সে কি সোজা কাজ ?

'দংশন-ক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

এমনি দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

মারাঠা সৈন্য মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, মুঘল-বাহিনী তছনছ ক'রে দিয়ে কর্পূরের মতো উবে যায়। আর শম্ভুজীর আস্তানার খবর কোন দুর্মুখই আনতে পারে না।

কিন্তু ভোজবাজি জানতেন আলমগীর। অসাধ্য-সাধন ক'রলেন তিনি। একজন শির্কপ্রজা সন্দেশ বহন ক'রে আনল।

মুকর্‌রব খান রত্নাগিরি থেকে বাইশ মাইল দূরে সঙ্গমেশ্বরে হানা দিয়ে শম্ভুজীর গোপন শিবির ঘিরে ফেল্লেন নিশুতি রাতে।

...শিবিরে আলো জ্বলছে। সোনার দীপাধারে কেঁপে কেঁপে উঠছে দীপশিখা।

অত রাত্রে কি ক'রছেন মহারাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা ?

যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করছেন ?

সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত ?

না।

শিবির থেকে বাজনার আওয়াজ আসছে।

রণবাদ্য ?

তাও না।

সারঙ্গী তবলার সঙ্গে নূপুর-নিক্কণ।

মুক্তার ঝালর দেওয়া কিংখাবে অর্ধশায়িত শম্ভুজী। এক বারবনিতার কানে কানে মধুগুঞ্জনে নিবিষ্ট। চোখ দু'টি জবা

ফুলের মতো রাঙা। হাতে তরবারি নয়,—কারণবারি।

তাঁর অমাত্য কবি-কুলাশ মদিরা-মাহাত্ম্যে বাহ্যজ্ঞানহীন।

শিবিরে উড়ছে ভাগোয়া ঝাণ্ডা নয়;—মকরকেতন।...

বামা ও বারুণীর বীতংসে আবদ্ধ শম্ভুজী ও কবি-কুলাশকে মুখে চুনকালি মাখিয়ে, পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, ঘণ্টি দেওয়া গাধার টুপি পরিয়ে, বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে উটের পিঠে চালান করা হ'ল বাহাদুরগড়ে। সম্রাট্-সকাশে।

* *

মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি, একমাত্র আশার প্রদীপ শম্ভুজী।

প্রদীপ সংযত থাকলে আলো দেয়। অসংযত হ'লে পুড়িয়ে ছারখার করে।

কাল হ'য়েছিল তাঁর সুরা ও সুন্দরীর প্রতি অসাধারণ আসক্তি।

জন্ম-পত্রিকায় শম্ভুজীর কোন রাশি ছিল তা দৈবাচার্যেরই জানা সম্ভব। প্রজা-সাধারণের জানার কথা নয়। তবে তারা এটা বেশ জানতো যে মদিরেক্ষণা নারীর কাছে নর-শার্দূল শম্ভুজীর রাশি মেষ। সেখানে তিনি ভেড়া ব'নে যান কামরূপ কামাখ্যার মন্ত্র ছাড়াও।

শশাঙ্ক-শেখর শম্ভুর ভালে কলঙ্ক আছে চাঁদে। শম্ভুজীর ললাটে চাঁদ নেই, আছে কলঙ্কটুকু। এ সত্যও কারো অজানা ছিল না।

পাবকের সঙ্গে প্রভঞ্জনের ন্যায় তাঁর সঙ্গে জুটেছিল চাটুকার সচিব কবি-কুলাশ। কনৌজের এক ব্রাহ্মণ। রাজনৈতিক

দূরদৃষ্টির অভাব সে পূরণ ক'রে নিয়েছিল প্রখর স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে। মহারাষ্ট্রের প্রজারা তাকে ঘৃণা করত। তার নাম দিয়েছিল 'কলুষ'। কপি-কলুষ।

শম্ভুজীর অসংযত চরিত্রে ব্যথিত চিন্তিত হ'য়েছিলেন শিবাজী। তাঁর অখণ্ড-ভারতের স্বপ্ন বুঝি ব্যর্থ হবে! ব্যর্থ হবে এই শতধা-বিচ্ছিন্ন আত্মঘাতী-জাতিকে একতার সূত্রে গাঁথার জীবনব্যাপী সাধনা? গুরু রামদাসের দেওয়া ত্যাগের মন্ত্রকে বিফল ক'রে দিয়ে তাঁর সাধের ভাগোয়া ঝাণ্ডাকে পথের ধূলোয় লুটিয়ে দেবে তাঁরই আত্মজ শম্ভুজী?

পুত্রকে অনেক বুঝিয়ে গুরু রামদাস সমর্থের কাছে শিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সব ভস্মে ঘি ঢালা।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

ফল হ'ল উল্টো।

শম্ভুজী অকস্মাৎ এক ব্রাহ্মণ-বধূকে হরণ ক'রলেন।

ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে খড়্গ দিয়ে শিবাজী সহস্তে অপদার্থ পুত্রের মাথা কেটে নিতে গিয়েছিলেন।

তাঁকে নিরস্ত করেন গুরু রামদাস।

শম্ভুজীকে তখন শিবাজী পন্‌হলার দুর্গে আবদ্ধ ক'রে রাখেন। পুত্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন পিতা।

এ ইতিহাস ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।…

শিবাজীর তিরোধান ঘটেছে। শম্ভুজী বন্দীদশা থেকে কৌশলে মুক্তিলাভ ক'রেছেন। সিংহাসন থেকে বৈমাত্রেয় ভাই, দশ বছরের ছেলে, রাজারামকে নামিয়ে কয়েদ ক'রেছেন। বিমাতা সোয়ারা বাঈ এবং তাঁর সমর্থকদের হত্যা ক'রে রক্তকর্দম পিছল পথে পিতার সিংহাসন অধিকার ক'রেছেন।

তাঁর অভিষেক হয় ২০শে জানুআরি, ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে।

তারপর মুঘল ও পর্তুগীজদের পর্যুদস্ত ক'রেছেন দিনের পর দিন।

মহারাষ্ট্রের নগর-প্রান্তর বন-উপবন চারণ কবিরা মুখরিত ক'রে তুল্‌ল শম্ভুজীর বিজয় কাহিনীতে।

আবার বুঝি নূতন রূপে ফিরে এলেন ত্রাণকর্তা শিবাজী। বুঝি অবতীর্ণ হ'লেন স্বয়ং শূলী-শম্ভু।...

মহারাষ্ট্র সত্যই মহা-রাষ্ট্রে পরিণত হবে—সকলের প্রাণে এই আশা।

কিন্তু আশা কুহকিনী।

পুণ্যশ্লোক নলরাজের দেহে কলি প্রবেশ করার মতো শম্ভুজীর বয়স্য হ'য়ে জুটল 'কলুষ'।

শম্ভুজী ভবানীর আরাধনা ভুলে মনসিজের সেবায় মন দিলেন।...

* *

শম্ভুজী ও কবি-কুলাশকে আওরঙ্গজেবের শিবিরে আনা হ'লে তিনি নীরবে মসনদ থেকে নেমে নামাজ পড়লেন। নামাজ

শেষ হ'লে বন্দীদের খুব কাছে এসে বেশ ভাল ক'রে তাদের নিরীক্ষণ ক'রলেন। শকুনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শনাক্ত ক'রলেন চিহ্ন মিলিয়ে মিলিয়ে। তারপর তাদের অন্ধকূপে রাখার নির্দেশ দিয়ে বিশ্রাম ক'রতে গেলেন।

অনেকদিনের ঘুম বাকী পড়েছিল। সুদ সুদ্ধ আদায় ক'রে নিলেন। ঘুমের বেলায় সুদ হারাম নয়।

পরদিন শম্ভুজীর কাছে সম্রাট্ সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন।

সন্ধির সর্ত হ'ল যে যদি তিনি তাঁর অধিকৃত সমস্ত দুর্গ ও গোপন সম্পদ সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং যদি মুঘল রাজপুরুষদের মধ্যে যাঁরা গোপনে শম্ভুজীকে সাহায্য ক'রেছেন তাদের নামগুলো প্রকাশ ক'রে দেন তবেই সম্রাট্ তাঁকে মার্জনা ক'রে নিজের দরবারে একজন মনসবদার করার কথা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন। অন্যথায় প্রাণদণ্ড অবধারিত।

প্রাণের মায়া বড় মায়া।

সম্রাট্ জানতেন তাঁর প্রস্তাব অচিরে গৃহীত হবে। তাঁর চুল দাড়ি অকালে পাকেনি। পেকেছে বয়সে, অভিজ্ঞতায় ও বিচক্ষণতায়।···শুধু মানব-চরিত্র কেন, নভোমণ্ডল তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখমণ্ডলে।

কিন্তু পাহাড় দেশের কাটখোট্টা শম্ভুজীকে চিনতে তাঁর তখনও বাকী ছিল।

যশোবন্ত সিংহ, দুর্গাদাস আর শিবাজীকে দেখেও তাঁর চৈতন্য

হয়নি। আক্কেল হয়নি তেগ বাহাদুরকে দেখে। 'যো শির দিয়া, সর ন দিয়া'। তাই এমন প্রস্তাব ক'রতে পেরেছিলেন।

প্রস্তাব শুনে শম্ভুজী তো হেসে কুটিকুটি।

'কি ক'রতে হবে? দুর্গ আর ধনরত্নগুলো হাতে তুলে দিতে হবে? ডাইনীর হাতে একমাত্র পুত্র সমর্পণ?'

'আর বেইমানি ক'রতে হবে তাদের সঙ্গে যারা দুঃসময়ে সাহায্য ক'রেছে?'

'তাহলেই আর কোন বাধা থাক্‌বে না মনসবদার হ'তে? নেমে আসবে সৌভাগ্যের পুষ্পক রথ?'

আবার একচোট হেসে শম্ভুজী গড়াগড়ি দিলেন মাটিতে।

হাত পা বাঁধা লোহার শিকলে। না হলে বুঝিবা তিনি নৃত্যই ক'রতেন।

তিনি রাজপুত্র। রাজা। বয়স্য-বিদূষক তাঁরও দু'-দশজন ছিল। কিন্তু এমন হাসির কথা তাঁকে শোনায়নি কেউ কখনও।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে উঠে বসলেন শম্ভুজী। প্রস্তাবের পালটা জবাব পাঠালেন,—

'তুর্কীটার মর্কটের মতো চেহারা হ'লেও তার মেয়েরা শুনেছি হুরীর মতো খাপসুরত। মেয়ের সঙ্গে শাদি দিয়ে তুর্কীটা আমাকে ঘরজামাই রাখলেই তো গোল চুকে যায়।'

এই উত্তম প্রস্তাবে উৎফুল্ল হ'য়ে কবি-কুলাশ ঘন ঘন মাথা নাড়ল শুধু।

"কী?...এত বড় কথা!" সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রল

বাদশার। হুকুম দিলেন,—

"বেতমিজ কাফের দু'টোকে যন্ত্রণা দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ কর।"

ধরে আনতে বল্‌লে বেঁধে আনার লোকের অভাব কোন দেশে কোন কালেই হয় না।

লম্পট অষ্টম হেনরীর নিত্য-নতুন বিয়ের সাধ মেটাতে অনুচরেরা কেটে আনেনি টমাস মোর আর জন ফিশারের মাথা ?

বাদশারও খিদমতগারদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা একদিন মনে মনে গিন্নীর গয়নার ফর্দ ক'রতে ক'রতে খোদ বাদশার দাদারই ছিন্নমুণ্ডের সওগাত এনে হাজির ক'রেছিল। আর এরা তো···।

সেদিনই রাত্রে শম্ভুজীর অন্ধকার কারাকক্ষে ক'জন লোক ঢুকে গরম লোহার শিক দিয়ে তাঁর চোখ দু'টো উপড়ে নিল।

পরদিন তারা কেটে ফেল্‌ল কবি-কুলাশের জিব।

দু'টোই খাওয়ান হ'ল কুকুরদের।

এইভাবে চব্বিশ দিন ধরে প্রত্যহ চল্‌ল সারমেয়দের ভোজ আর জল্লাদদের 'মচ্ছব'।

তারপর একদিন দু'জনের মাথা কেটে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের বড় বড় শহরে ঢাক ঢোল শিঙা বাজিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে দেখান হ'ল।···

তারিখটা হ'ল ২১শে মার্চ, ১৬৮৯। রক্তের অক্ষরে লেখা দিন।

পূর্ণ হ'ল মনস্কাম।

সফল হ'ল শপথ।···

অনেক দিন পরে মাথায় মুকুট দিয়ে মসনদে আসীন হ'লেন সম্রাট্।

শাহান শাহ্ আবুল মুজঃফ্ফর মুহী-উদ্-দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলম্গীর পাদশাহ্ গাজী।

শ্বেত-উষ্ণীষে হীরকখণ্ড জ্বলজ্বল ক'রতে লাগ্ল।

চোখ দু'টি বুজে কিছুক্ষণ ধরে তসবি মালা জপ ক'রলেন তিনি। আঙুলের ওপর একে একে ঘুরে গেল সোনার সূতোয় গাঁথা নিরানব্বইটি কালো পাথরের টুকরো।

তারপর অকৃপণ হাতে তিনি বিতরণ ক'রলেন,—শিরনি, শিরোপা, সনদ।

## ॥ দশ ॥

চন্দ্রবংশাবতংস রাজা নহুষ স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ ক'রে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রেছিলেন।

উগ্রতপা ঋষিদের দিয়ে শিবিকা বহন করিয়ে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। মাথা নীচু ক'রে বুকে হেঁটে চল্‌তে হ'য়েছিল তাঁকে।···

মহাশত্রু শম্ভুজীকে নিপাত ক'রে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব নিজেকে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান ক'রলেন। ভাবলেন তাঁর সকল প্রচেষ্টা সার্থক হ'য়েছে। পূর্ণ হ'য়েছে সকল অভিলাষ। কাবুল থেকে চট্টগ্রাম আর কাশ্মীর থেকে কাবেরী তট পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছে তাঁর সাম্রাজ্য। এইবার মনের সুখে রাজত্ব ক'রবেন। মারাঠা সর্দারদের দিয়ে তাঞ্জাম বহন করিয়ে মনের খেদ মেটাবেন। সফল হবে তাঁর বহুদিনের বাসনা।

উদ্যোগ আয়োজন চল্‌তে লাগল মহারাষ্ট্রের সমর-নায়কদের কয়েদ ক'রে আনার।

কিন্তু তাঁর সে আশায় ছাই পড়ল।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

সন্ত, সম্রাট্ আর শৌহর যখন মনে করে যে তার বাঞ্ছিত বস্তু পেয়ে গেছে, তার সাধনা শেষ হ'য়েছে, সিদ্ধি করতলগত; তখনই সে নিজেকে ঠকায়। সাগর-সৈকতে ঝিনুক কুড়ানই সার হয়।

রত্নগর্ভের অতলে যে রত্নের ভাণ্ডার তা থেকে যায় তার আয়ত্তের বাইরে।

'সব পেয়েছি', বলে মুঠি বন্ধ ক'রতে গিয়ে আওরঙ্গজেব দেখলেন মুঠি খালি। রিক্ত।··

জয়ের ছদ্মবেশে এলো অপরাজেয় আলমগীরের চরমতম পরাজয়।···

গুণী ব্যক্তিরা বলেন, জ্যান্ত হাতির চেয়ে মরা হাতির দাম বেশী।

কিন্তু জীবিত শম্ভুজীর চেয়ে মৃত শম্ভুজীর শক্তি ও মর্যাদা বেশী হবে সে কথা কে ভেবেছিল?

মন্ত্রী মুরশেদ কেউ বাদশাকে সে কথা বলেন নি। আর বল্লেও কি তিনি সে কথা শুনতেন? কাউকে কি বিশ্বাস ক'রতেন তিনি? আর পাঁচজনের মতো নিজের বুদ্ধিকেই বড় ক'রে দেখেছিলেন। নিজের শক্তিকেও।

রক্তবীজের এক একটি রুধির-বিন্দু মাটিতে পড়ে যেমন এক একটি ঐ রকম অসুর সৃষ্টি ক'রেছিল, শম্ভুজীর প্রতিটি শোণিত কণিকা প্রতিটি মারাঠীকে জাগিয়ে তুল্‌ল মোহনিদ্রা থেকে। জাগিয়ে তুল্‌ল দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানকে। উদ্বুদ্ধ ক'রল অত্যাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

প্রতিহিংসার পাবক জ্বলে উঠল দিকে দিকে। শিখা বিস্তার ক'রল দাক্ষিণাত্যের কোণে কোণে।...

সে যজ্ঞাগ্নি নেভায় সাধ্য কার?

এই মহামারণযজ্ঞকে জন্মেজয়ের সর্পসত্রের সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

এই যজ্ঞের যজমান হলেন রাজারাম। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র। আর শম্ভুজীর বিধবা। জেসু বাঈ।

ঋত্বিক্ হ'লেন সাক্ষাৎ কৌটিল্যের ন্যায় কুশাগ্র-বুদ্ধি প্রহ্লাদ নিজোরী। সে সময়ে মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও কূটনীতিবিদ্ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল।

তাঁর সহকারী হ'লেন অগ্নিকল্প রামচন্দ্র নীলকান্ত পন্থ এবং ভাস্বর বহ্নির ন্যায় তেজস্বী শঙ্করজী মল্হর।

এই দুই দিক্‌পালের অধীনে রইলেন চারজন সুযোগ্য মারাঠা সর্দার,—পরশুরাম ত্র্যম্বক প্রতিনিধি, শঙ্করজী নারায়ণ সচিব, ধনজী যাদব, শান্তাজী ঘোড়্‌ফড়ে।

তাঁদের বুকে দুর্জয় সাহস। বাহুতে অমিত শক্তি। চিবুকে অটল প্রতিজ্ঞার সাক্ষর।···

মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এঁদের প্রেরণায় রূপ নিল গণযুদ্ধের। বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল উত্তাল জনসমুদ্র। তার ভৈরব-গর্জনে শত্রুর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হ'ল।

সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগ দিতে লাগল যুবক বালক বৃদ্ধ।

পাশাপাশি দাঁড়াল হিন্দু-মুসলমান।

ধর্মের চেয়ে দেশ বড়। স্বর্গের চেয়ে, বেহেস্তের চেয়ে, বড় জননী আর জন্মভূমির ইজ্জত।

এ আত্মরক্ষার লড়াইয়ে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমানে মিল হ'য়ে গেল। সে মিল ধর্মগত নয়। মর্মগত।

বর্শা, ভল্ল, কৃপাণ, টাঙ্গি, লাঠি, শাবল যার যা ছিল সেই অস্ত্র নিয়ে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হ'ল।

কাউকে তন্‌খা দিতে হবে না। যোগাতে হবে না পোষাক আর রসদ। লুটপাট ক'রে যা পাওয়া যাবে তাতেই ভাবতে হবে না সাতপুরুষ।

অবলারাও পিছিয়ে থাকলেন না। অভিজাতেরা নিলেন অসি। দরিদ্রা নিলেন কাস্তে কুড়ুল।

প্রাসাদ আর পর্ণকুটীরে ব্যবধান ঘুচে গেল।

অস্ত্র হাতে নিয়ে শম্ভুজীর নামে সকলে শপথ নিলে মুঘল বাহিনীর কোন অত্যাচার তারা সইবে না। সূচ্যাগ্র মেদিনী ছেড়ে দেবে না বিনা যুদ্ধে। কোথাও তাদের দু'দণ্ড তিষ্ঠতে দেবে না শান্তিতে।

ওদিকে সম্রাটকে আক্রমণের নীতি ছেড়ে তৎপর হ'তে হ'ল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায়। কিন্তু একে একে তাঁর সকল চেষ্টা বিফল হ'ল।

রাজস্ব ঠিক মতো আদায় হয় না। ঠিক সময়ে আসে না। রাজকোষ কপর্দকশূন্য। নিদারুণ অর্থসঙ্কট।

মাইনে না পেয়ে সৈন্যেরা বিদ্রোহী হ'ল। বিপক্ষ শিবিরে যোগ দিতে লাগল।...

এই দৈন্যের মরুতে একমাত্র পান্থপাদপ সোনার বাঙ্‌লা।

বাঙ্‌লার সুবাদার মুর্শিদকুলি জাফর খান্ ভূস্বামীদের নরকতুল্য 'বৈকুণ্ঠে' কয়েদ ক'রে খাজনা নজরানা আদায় ক'রে বাদশাকে পাঠান। তাতেই সম্রাট্ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। সৈন্যদের বাকী বকেয়াও কিছুটা মেটান হয়। দেউলে হ'তে দেরি নেই। 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' অবস্থা।

একদিন ফকিরি নিতে চেয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। সেই বহু-বাঞ্ছিত ফকিরি আজ তাঁর দরজায় হাজির। আতঙ্কে শিউরে উঠে তিনি ভাবেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই'।...

এই ডামাডোলের সুযোগে রাজপুত, শিখ আর জাঠেরা মাথা তুল্‌ল। বাঙ্‌লা দেশে উপ্ত হ'ল নবাবীর বীজ। রাজ্যের লোভে তাঁর মৃত্যুকামনা ক'রে ছেলেরা আঙুল মটকাতে সুরু ক'রল।

সম্রাটের শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।...

বাহিনী দূরে থাক তাঁর নিজের শিবিরটুকু রক্ষা করা দুর্ঘট হ'য়ে পড়ল। শিবিরে তাঁর সঙ্গে আছেন আর্মেনিয়ন বেগম উদিপুরী—দারার বিধবা—এবং আদরের কন্যা জিন্নত-উন্নিসা।

আওরঙ্গজেব যুদ্ধ ছেড়ে দিল্লীতে ফিরে যেতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু তিনি ছাড়তে চাইলেই যা হবে কেন? 'কমলি ছোড়তী নহি'।...

তাছাড়া ফিরে গিয়ে লোককে মুখ দেখাবেন কি ক'রে?

লোকের কথা থাক্। এমনিতেই অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে

দর্পণে নিজেকেই মুখ দেখাতে লজ্জা করে। নিজের দৃষ্টিই সহ্য হয় না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে ভেংচি কাটতে ইচ্ছে হয়।...

নামাজের সংখ্যা ও সময় ক্রমেই বাড়তে থাকে।

'গুনাহ্ মাফ করো খোদা। রহম করো রহিম আর বাপ-ভাই 'এর রূহ্।'

বিড়বিড় ক'রে এই কথা বলেন আর মাথা চাপড়ান তিনি।

অনুশোচনার মধ্য দিয়ে কি আরম্ভ হ'য়ে গেল তাঁর সংখ্যাতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ?...

নরকাগ্নির দহন-জ্বালা কি সুরু হ'য়ে যায় ইহ-জীবনেই ?...

কবি-কল্পিত স্বর্গ-নরকের অধিষ্ঠান কি মানুষেরই অন্তরে ?...

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহগড়ে মৃত্যু হ'ল রাজারামের।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মৃত্যু হ'ল তাঁর।

শম্ভুজী তাঁকে বন্দী করেছিলেন কৈশোরে। অনেকদিন কারাগারে কাটিয়ে শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজা হ'য়ে তিনি চিকিৎসার অজুহাতে ক'রেছিলেন অহিফেনের অভ্যাস।

প্রদীপ নেভার আগে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল একবার। সেই হঠাৎ-আলোর-ঝল্কানিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল তামাম হিন্দুস্থান।...

মহারাষ্ট্র পতাকা অবনমিত ক'রল এই বীরের সম্মানে। তর্পণ ক'রল নয়নের অশ্রু দিয়ে।

কিন্তু যাঁর চোখে অশ্রুর মন্দাকিনী নামার কথা তিনি শুষ্ক চোখে অবিচল চেয়ে রইলেন দিগন্তের পানে। যেখানে অশ্বক্ষুরে উঠেছে ধূলোর ঝড়।...

অশ্রু-উৎসবের অবকাশ কোথা তাঁর ?

চারিদিকে শত্রু। এই অবনমিত পতাকার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ করে পতাকার অবমাননা ?

নৃমুণ্ডমালিনীর মতো শত্রু নাশ ক'রতে পারলে তবেই নিভৃতে দু'নয়নের ধারায় তিনি স্নান ক'রে অশৌচ পালন ক'রবেন।... কনককেয়ুর, ক্বণৎকাঞ্চিদাম, কবরীর রক্ত-করবী আর রক্তাম্বর পরিত্যাগ ক'রে পরিধান ক'রবেন সিত-বসন। প্রিয়তমের বিগ্রহে দুলিয়ে দেবেন একগাছি রজনীগন্ধার মালা।...

শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন অষ্টাদশী তারা বাঈ। ৺রাজারামের গৃহিণী, সচিব, মিত্র। এখন সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণা। একাধারে তিনি বীরুধ্ ও বীরা।

রাজনীতি ও রণনীতি দু'য়েতেই তাঁর সমান দখল। কাফী খান্ প্রভৃতি বিপক্ষের ঐতিহাসিকেরা অকুণ্ঠভাবে এই রমণীর যশোগান ক'রেছেন।

তারা বাঈ বর্ম ও বল্লমে ভূষিতা হ'য়ে অশ্বপৃষ্ঠে মারাঠা-বাহিনীর পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন।...বেজে উঠল রণ-দামামা।...

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ তখনও বাকী।...

## ॥ এগারো ॥

Apres moi le deluge.

"আমার পরই আসবে প্রলয়-বন্যা।"

আসন্ন দুর্যোগের সম্ভাবনায় খেদোক্তি ক'রেছিলেন ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই।

তাঁরও অনেক আগে ভারত-সম্রাট্ আলমগীর গভীর পরিতাপের সঙ্গে ঐ একই কথা বলেছিলেন,—"অস্-মাস্ত হমাহ্ ফসা-ঈ-বাকী।"

উভয়েরই ভবিষ্যদ্‌বাণী আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল।

ধর্ম নয়, ধর্মান্ধতাই তাঁর কাল হ'য়েছিল।

একান্তভাবে সুন্নী মুসলমান আওরঙ্গজেব শেষ বয়সে দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন দেওয়াল গাঁথতে।

হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দেওয়াল। শিয়া ও সুন্নী মুসলমানের মধ্যে দেওয়াল।

সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর।

বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন প্রতিবাসীর সঙ্গে প্রতিবাসীর। ভাই'এর সঙ্গে ভাইয়ের।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথম, দুর্দান্ত মারাঠাদের শায়েস্তা করা। আর দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু শিয়া মুসলমান রাজত্বগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা।

কিন্তু সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে একাদিক্রমে লড়েও তিনি সফলকাম হ'তে পারেন নি। উপরন্তু এটিই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ভুলে পর্যবসিত হ'য়েছে।...এখানেই তিনি শুধু নিজের নয় মুঘল গরিমারও সমাধি রচনা ক'রেছেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর এইখানে তৈমুর বংশ ও মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখের অন্ন যেমন বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছিল, চোখের ঘুমও তেমনি ঘুচে গিয়েছিল। সে সময় তাঁকে দেখলে মনে হ'ত যেন পক্ষহীন বিহগ, পত্রহীন বিটপী, উত্তাপহীন অগ্নি।...

হাড়ে হাড়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। মজ্জাগত অবিশ্বাস। অসুস্থ বার্ধক্য-জীর্ণ শরীর। আতঙ্ক-বিহ্বল সৈন্যদল। এই নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রাম ক'রতে ক'রতে আহমদনগরের শিবিরে পৌঁছে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নব্বই বছর বয়সে, চরম বিপর্যয়ের মধ্যে সম্রাট্ আল্লার নাম নিয়ে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন।...

মুঘলপঙ্কজরবি গেল অস্তাচলে।...

*　　　*　　　*

তিনি গেলেন বটে তবে তাঁর গড়া প্রাচীর—অসমাপ্ত হ'লেও—রয়ে গেল।

হাম বসন্ত কলেরা যক্ষ্মা প্রভৃতি যত রকম সংক্রামক ব্যাধি আছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক হ'ল সাম্প্রদায়িকতা। ডাক্তারী শাস্ত্রে এর নাম নেই। এর নাম আছে সমাজ-

বিজ্ঞানের পাতায়।

কলেরা বসন্ত প্রাণে মারে। সাম্প্রদায়িকতা প্রাণে মারার আগে আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোলে। এর একমাত্র প্রতিষেধক হ'ল জনগণের সেক্যুলার মনোভাব গড়ে তোলা। এ একদিনের কাজ নয়। এ কাজ সাধনা-সাপেক্ষ।

আওরঙ্গজেব যে বীজ ছড়িয়ে গেলেন উপযুক্ত প্রতিষেধকের অভাবে তার ছোঁয়াচ লাগল মারাঠাদের মনে। বিষিয়ে উঠল তাদের অন্তরাত্মা। শিবাজীর অপক্ষপাতের সাধনাকে ব্যঙ্গ ক'রে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।...

ওদিকে তখন ভাগীরথীকূলে ফিরিঙ্গী বেনিয়াদের মানোয়ারী জাহাজের ভিড় একটু বেশী ক'রে লাগতে আরম্ভ হ'য়েছে। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের কদলী প্রদর্শন ক'রে ইংরেজ 'বণিকের মানদণ্ড' 'রাজদণ্ডরূপে' দেখা দেওয়ার পথ খুঁজছে।...

...এ যুগে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে ইংরেজ। বাঙ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে ব্রিটিশ এ্যাড্‌মিরাল্ ওয়াটসন্ শাসিয়েছিলেন, "I will kindle such a flame in your country, as all the water in the Ganges shall not be able to extinguish."

সে আগুন তারা জ্বালিয়ে গেছে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধিয়ে। আর শুধু গঙ্গা নদী কেন, গঙ্গা-গোদাবরী-সিন্ধু-কর্ণফুলির জলেও সে আগুন এখনও নেভেনি।...ঘরপোড়া উদ্বাস্তুরা আজও পথে পথে ঘুরছে।...

'তুরুক তেল, হিন্দু ফলিতা, দিয়না
বরনে লাগি।
বীচ মহলমৈ বরৈ আরতী রীঝৈ
সাহিব রাগি ॥'

মুসলমান তেল ও হিন্দু পলিতার মিলনে অপূর্ব প্রদীপ জ্বল্‌ছে। মন্দিরের মাঝে এই প্রদীপে আমার প্রেমিক-দেবতার আরতি অবিরাম চলেছে।...

মধ্যযুগে সাধক কবি কবীর মানস-নেত্রে যে দেবতার অর্চনা দেখেছিলেন সে কি শুধু স্বপ্ন ?...শুধু কল্পনা-বিলাস ?···

* * *

মৃত্যুকালে পুত্র আজম শাহ্‌কে এক পত্রে সম্রাট্ আলমগীর লিখেছিলেন, "···জগতে আগন্তুকের মতো এসেছিলাম, অপরিচিতের মতোই বিদায় নিতে হ'চ্ছে।...সাম্রাজ্যের যোগ্য অভিভাবক ও উপযুক্ত রক্ষক হ'তে পারিনি। আমার জীবনের অমূল্য সময় বৃথাই নষ্ট ক'রেছি।

"বিবেকের কিছু অংশ আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র আলো আমার ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে অদেখা রয়ে গেল।...

"মানুষের সহজাত দোষ-ত্রুটি ও তুচ্ছতা ছাড়া এ জগতে আমি কিছুই সঙ্গে আনিনি, নিয়েও যাচ্ছিনা কিছু।...আমার আত্মার মুক্তির বিষয়ে আমার মনে দুশ্চিন্তার আর অবধি নেই। জানিনা পরলোকে কী রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমার প্রাপ্য হ'য়ে রয়েছে।

"যদিও ঈশ্বরের অপরিসীম বদান্যতা ও অসীম ক্ষমায় আমার গভীর আস্থা আছে, তবু নিজের কৃতকর্মের জন্য নিদারুণ ভয় আমাকে ত্যাগ ক'রবে না।...যা হয় হোক, আমি তো উত্তাল তরঙ্গে তরণী ভাসিয়ে দিয়েছি।...বিদায়...বিদায়...বিদায়।"

প্রিয়তম পুত্র কামবক্সকে লিখেছিলেন, "...আমার অপরিসীম পাপের বোঝা ও জীবনের অপূর্ণতা সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম।...জীবনে সংখ্যাতীত পাপ ক'রেছি। জানিনা তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে কোন্ গুরুতর দণ্ড নির্ধারিত হবে আমার জন্যে।"

মৃত্যুশয্যা থেকে দুই পুত্রকে লেখা এই চিঠিগুলি যেমন বিষণ্ণ, তেমনি গভীর অনুশোচনায় ভরা। এর প্রধান সুর পরলোকে শাস্তির জন্য সদাজাগ্রত আতঙ্ক। নিজের দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা। বিবেককে পদদলিত করার জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারানোর জন্য অনুতাপ। এখন একমাত্র শেষ ভরসা ঈশ্বর। কিন্তু তিনি যদি মার্জনা না করেন এই দুশ্চিন্তার দহন।

ইস্‌লাম ধর্ম আওরঙ্গজেবের অন্তরতম প্রদেশে যেভাবে প্রতিভাত হ'য়েছিল সেটির সঙ্গে ষোড়শ শতকের য়ুরোপের খ্রীষ্টহীন খ্রীষ্টধর্ম 'কেল্‌ভিনিজম্' বা জন কেল্‌ভিন্ প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

পবিত্র কুরানে ঈশ্বর বারবার পরমকরুণাময় অনন্তক্ষমাশীল ভাবে বর্ণিত হ'লেও চিঠি দু'টিতে সম্রাটের মনে সে বিষয়ে বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

ঈশ্বর তাঁর অন্তিমকালে শুধু ক্ষমাহীন দণ্ডদাতা—নিরপেক্ষ

নির্মম বিচারকরূপেই দেখা দিয়েছেন ।

'Quando tremor est futurus
Quando Judex est venturus'.

শেষ বিচারের আতঙ্কে এমন মর্মভেদী আর্তনাদ আর কখনও শোনা যায়নি।…

## ॥ বারো ॥

সিংহ আর শৃগাল।

পাশাপাশি।

ঠিক পাশাপাশি নয়, সামনা-সামনি।

রাস্তার ওপার আর এপার। ওপারে সিংহ। এপারে শৃগাল।

বাস্তবিক শ্মশানের চেয়ে বড় সাম্য-সংস্থাপক আর নেই। বাদশা ফকির, পণ্ডিত মূর্খ, সুন্দর কুৎসিত, ইমানদার বেইমান সব এখানে সমান। সর্বংসহা ধরিত্রীমাতার কোলে সকলেই মহানিদ্রায় আবৃত। সকলের ললাটে একই মাটির তিলক।...

ওপারে পুরুষ-সিংহ আওরঙ্গজেব। এপারে ধূর্ত শৃগাল মীর কুমার-উদ্‌-দীন। যেমন কিতব, তেমনি ফন্দিবাজ।

দেড় গজী নাম তাঁরও আছে। আমীর-উল্-উমরা মীর কুমার-উদ্-দীন চিন্ কিলিচ্ খান্ খান-তুরাণ নিজাম-উল্-মুল্ক বাহাদুর ফতহ্ জঙ্গ আসফ জাহ্।

হায়দ্রাবাদ নিজাম-রাজবংশের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।...নিজাম শব্দের অর্থ নিয়ামক, মুল্ক অর্থে দেশ, ফতহ্ জঙ্গ অর্থাৎ সমর-বিজয়ী। আসফ জাহ্ মানে আসফের তুল্য। ইতিহাস-বিশ্রুত রাজা সলোমনের বিচক্ষণ মন্ত্রীর নাম ছিল আসফ।...

কূট-কৌশলে নিপুণ উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর অসির তীক্ষ্ণতার চেয়ে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল অনেক বেশী। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ফলবতী করার জন্য তিনি অযথা বিক্রম প্রদর্শন না ক'রে সুযোগের প্রতীক্ষায় থেকেছেন। তাক্ বুঝে হিসেব ক'রে মস্তিষ্ক প্রয়োগ ক'রেছেন আর ভাগ্যের জয়মাল্য পেয়েছেন বারে বারে।

এত বড় আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ আর জন্মায়নি। কখন কোন্ দিকে হাওয়া বইবে তিনি ঠিক টের পেতেন। ইংরেজরা যাকে বলে 'ওয়েদার কক্'—তিনি ছিলেন ঠিক তাই।

যখন যেদিকে হাওয়া বয়েছে সেই দিকে ঘুরে গেছে তাঁর মুখ। এই ঐতিহ্য তাঁর বংশধরেরা আজও বজায় রেখেছেন। একেই বলে সাধনা।

বেনিয়া ইংরেজ এদেশে রাজ্য বিস্তারে মন দিলে এই রাজবংশই প্রথম বুঝতে পারে যে, মুঘল মারাঠা রাজপুত জাঠ ও শিখদের দিন ফুরিয়েছে। এখন সাদা ঘোড়াই রেস জিতবে।··· ইংরেজ একদিন হবে এ দেশের অধীশ্বর।···অম্‌নি তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে তাদের সব রকমে সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।

ইংরেজ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়। নিজামের কপালে তারা এঁকে দিয়েছে এক তিলক। 'E' এর তিলক। তাদের তাঁবেদার আর সব 'স্বাধীন' রাজা মহারাজারা H. H. নিজাম বাহাদুর শুধু H. E. H. ঐকান্তিক সেবার পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা একটা E বেশী পেয়েছেন। ইংরেজের এই পক্ষপাতে হিংসের আগুনে কলিজা পুড়ে গেছে আর সব খয়েরখাঁদের।

মীর কুমার-উদ্‌-দীনের পূর্বপুরুষের বাস বুখারায়। তাঁর ঠাকুর্দা খাজা আবিদ শেখ-উল্‌-ইস্‌লাম ছিলেন সেখানের একজন কাজী। তিনি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে আসেন ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার ফিকিরে। এ দেশে এসে তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরি নিয়ে গোলকুণ্ডার যুদ্ধে মারা যান। তাঁর বাপ গাজী-উদ্‌-দীনও আওরঙ্গজেবের সময় মুঘল সরকারে কাজ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

মীর কুমার-উদ্‌-দীন তেরো বছর বয়সে সামরিক বিভাগে কাজ পান। মুরুব্বীর জোর থাকায় ধাপে ধাপে না উঠে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তাঁর পদোন্নতি হ'ল। অল্পকালের মধ্যে তিনি খেতাব পেলেন চিন্‌ কিলিচ্‌ খান্‌ আর পদ পেলেন শাসনকর্তার।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই তাঁর তিন ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে চারদিক নিরীক্ষণ ক'রছিলেন বিজাপুরের প্রাসাদে বসে।

*

ছেলেদের মধ্যে যাতে গৃহযুদ্ধ না বাধে সেজন্য আওরঙ্গজেব মৃত্যুকালে একটি উইল ক'রে তাঁর জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। যে উপাধানে মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই বালিশের নীচে পাওয়া গিয়েছিল এই উইল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? তিনি নিজেই কি অর্ধশতাব্দী আগে, বাপের কথা শুনে, আর তিন ভাইয়ের সঙ্গে সাম্রাজ্য ভাগ

ক'রে নিতে রাজী হতেন ?

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার জন্যে তাঁর তিন ছেলেই কাটাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলেন।

তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম তখন কাবুলের শাসনকর্তা, আজম গুজরাটের এবং কনিষ্ঠ কামবক্স বিজাপুরের।

কামবক্স দাক্ষিণাত্য ত্যাগ ক'রে তখনই দিল্লী যেতে পারলেন না। সেখানেই বসে সম্রাটের সমস্ত উপাধি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে সে কথা জাহির ক'রলেন। নকীব নাম হাঁকল। বন্দী বন্দনা ক'রল। মোসাহেবরা মিষ্টি কথার ফুলঝুরি জ্বালল। কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজল না। প্রজারা তাঁকে মেনে নিল না বাদশা বলে।

জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাবুল থেকে আগ্রায় গিয়ে হানা দিলেন। আজমও পৌঁছলেন সেখানে।

মুয়াজ্জম প্রস্তাব ক'রলেন, 'ভাই যুদ্ধে কাজ কী ? বাবা যেমন ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন, এস আমরা তিন ভাইয়ে সেই উইল মেনে নিই।'

আজম জবাব দিলেন, 'ও সব উইল ফুইল বাজে কথা। তোমার কারসাজি। মসনদে হক্ আমার। হিম্মত থাকে বাধা দাও।'

তল্‌বার ছাড়া ফয়সলাহ্ করার আর কেউ যখন রইল না তখন দু'ভাইয়ে গজ-কচ্ছপের মতো তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন।

আজম শুধু যুদ্ধেই হারলেন না, প্রাণেও মারা গেলেন। বিজয়-উল্লাসে মুয়াজ্জম দাক্ষিণাত্যে অভিযান ক'রলেন। হায়দ্রাবাদের

কাছে কামবক্স তাঁর কাছে পরাজিত ও আহত হ'য়ে পালিয়ে গেলেন। কিছুকাল পরেই মৃত্যু হ'ল তাঁরও। নিষ্কণ্টক মুয়াজ্জম 'বাহাদুর শাহ্' উপাধি নিয়ে বাদশা হ'য়ে বসলেন। প্রথম শাহ্ আলম নামেও তিনি পরিচিত।

চিন্ কিলিচ্ খান্ দাক্ষিণাত্যে বেশ শক্তিমান হ'য়ে উঠছেন দেখে তিনি তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা ক'রে দেন।

বছর পাঁচেক রাজত্ব করার পর ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে বাহাদুর শাহ্ পরলোকে পাড়ি দিলে তাঁর চার ছেলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। তিন জন মারা পড়ল। জ্যেষ্ঠ জাহান্দার শাহ্ জুলফিকার খানের সহায়তায় সিংহাসন পেয়ে তাকে উজীর ক'রে দিলেন।

জাহান্দার শাহ্ নামেই সম্রাট্। সাম্রাজ্যের রশি কিন্তু রইল একজন স্ত্রীলোকের হাতে। রিজিয়া, চাঁদ বিবি, নূরজাহান, লক্ষ্মী বাঈএর মতো বীরাঙ্গনা নয়। জাহান্দারের এক রক্ষিতা। নাচ-ওয়ালী। নাম লাল কূঁয়ার। শোনা যায়, সঙ্গীতের যাদুকর তানসেনের বংশের মেয়ে।

জাহান্দার ছিলেন লাল কূঁয়ারের হাতের মুঠোয়। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'ইম্তিয়াজ মহল'। অলঙ্কার পোষাক বাদে বাদশা তাঁর এই সুখের পায়রাটিকে বছরে হাত খরচ দিতেন দু'কোটি টাকা।...

হাটে-বাজারে মাতলামো ক'রে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা দুজনে। ভব্যতা বা রুচির বালাই ছিল না আড়াল ক'রে।

শহরে একদিন গুজব রটে গেল যে 'চিরাগ্-ই-দিল্লী' মসজিদের পাশের দীঘিতে এক মৎস্য-কন্যা দেখা গেছে। উত্তমাঙ্গ নারী, অধমাঙ্গ মৎস্য।

হুজুকে লোক কম নেই। বহু লোক ছুটল দেখার জন্যে।··· হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার।···

গিয়ে দেখে একটা নয়। দু'টো।...ঠেলাঠেলি ক'রে আরো কাছে গিয়ে তখন পালাতে পথ পায় না সবাই।

কি ব্যাপার ? না, স্বয়ং বাদশা আর লাল কূঁয়ার। দুজনে দীঘির জলে সাঁতার দিচ্ছেন পড়ন্ত বেলায়। কারো গায়ে একটি সূতো পর্যন্ত নেই।

উদ্দেশ্য মহৎ। সন্তান কামনা। কে নাকি বাদশাকে ভরসা দিয়েছে যে ঐ দীঘিতে প্রতি রবিবার ঐভাবে জলকেলি ক'রলে বংশের বাতি জন্ম নেবে এই পুণ্যকার্যে।...কত বড় বংশ। লোপ পেতে তো দেওয়া যায় না !

লাল কূঁয়ারের কোন সাধ, কোন খেয়াল অপূর্ণ রাখতেন না জাহান্দার।

লাল কূঁয়ারকে খুশী করার জন্যে মাসে তিনবার ক'রে দিল্লীতে দেওয়ালি উৎসব ক'রতে হ'ত। তাতে দিল্লীতে তেল বাড়ন্ত

হ'ল। তখন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দেউলে হ'ল প্রজারা।...

একদিন প্রাসাদ-অলিন্দে জাহান্দারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন লাল কুঁয়ার। দেখলেন, মানুষ বোঝাই নৌকো ভেসে চলেছে নীচে—যমুনা নদীতে।

'মানুষ ভর্তি নৌকো ডুবতে আমি ককৃখনো দেখিনি,—' নাকি সুরে আব্দার ক'রলেন লাল কুঁয়ার।

'দেখনি ? তা এ আর এমন কি কথা ?...কোই হ্যায় ?'

অমনি বাদশার আদেশে প্রাসাদ-রক্ষীরা গিয়ে জোর ক'রে খেয়া নৌকো ডুবিয়ে দিলে।...নৌকো ভর্তি লোক বাঁচার শেষ চেষ্টা ক'রতে ক'রতে তলিয়ে গেল।...

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন লাল কুঁয়ার।

মুগ্ধ বিগলিত হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন জাহান্দার।...

*

ভারত-ভাগ্য-বিধাতা যখন নটীর রাতুল চরণে নূপুর হ'য়ে বাজছেন তখন যে ক'জন উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মীলাভের জন্য তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন চিন্ কিলিচ্ খান্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁকে সময়ে অসময়ে জাহান্দারের ভাইপো ফারুকশায়ারের মন্ত্রণা কক্ষে দেখা যেতে লাগল।...

সুহৃদ্‌গণের সাহায্যে জাহান্দারকে রাজ্যচ্যুত ক'রে বন্দী করা শক্ত হ'ল না ফারুকশায়ারের পক্ষে। শোভাযাত্রা ক'রে হাতির পিঠে চেপে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ ক'রলেন। তাঁর পিছনেই আবদুল্লা খান্ ও হুসেন আলি,—বিখ্যাত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এবং

চিন্ কিলিচ্ খান্। 'কিং মেকার ট্রায়ো'।

শোভাযাত্রার একেবারে শেষে এক হাতির পিঠে একটা লোক দাঁড়িয়ে কদর্য অঙ্গভঙ্গী ক'রছে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ। সেই বাঁশের ডগায় বাঁধা একটা মানুষের মাথা। চিন্‌তে অসুবিধে হয় না। জাহান্দারের মাথা।...

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হ'লেন উজীর ও প্রধান সেনাপতি। চিন্ কিলিচ্ খান্ হ'লেন দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের প্রতিনিধি,—ভাইস্‌রয়। উপাধি পেলেন খান্ খানান্ নিজাম-উল্-মুল্‌ক বাহাদুর ফতহ্ জঙ্গ।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই হ'লেন আসল বাদশা। ফারুকশায়ার শুধু দস্তখত করেন আর আফিম খেয়ে ঝিমোন।

হাওয়া কোন দিকে বইবে টের পেতে নিজাম বাহাদুরের দেরি হ'ল না। বাদশার সঙ্গে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের খিটিমিটি লাগতেই 'ওয়েদার কক্' বাদশার দিকে পিছু ফিরল।...

ফারুকশায়ার শেষ পর্যন্ত আশা করেছিলেন নিজাম তাঁকে সাহায্য ক'রতে আসবেন। কিন্তু কোথায় নিজাম? তিনি তখন দুর্যোগ কেটে যাবার অপেক্ষা ক'রছেন দাক্ষিণাত্যে বসে।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফারুকশায়ারকে অন্তঃপুর থেকে ধরে এনে অন্ধ ক'রে দিয়ে বন্দী ক'রে রাখলেন।

ফারুকশায়ার তো গেলেন। এখন 'রাজা রাজা খেলায়' সেজে-গুজে সিংহাসনে বসার জন্যে আর একটা পুতুল দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে তেমন পুতুল?

চেহারা আর বংশ হবে ভাল। হাত পা নাড়বে অথচ-

মগজ বলে কিছু থাকবে না। সব কিছু দেখে যাবে অথচ সাত চড়ে 'রা' কাড়বে না।···বাঙালী ঘরের শাশুড়ীদের বউ খোঁজার সামিল আর কি!

আওরঙ্গজেবের এক নাতিকে পছন্দ হ'ল। বাজনা বাদ্যি বেজে উঠল। কিন্তু কোথায় গেল সে পুতুল?

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। সে বেচারী তখন বাদশা হবার ভয়ে হারেমের কোণে এক আলমারির মধ্যে লুকিয়েছে।

কী আর হবে? 'সব পুতুলই সমান' এই মনে ক'রে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ফারুকশায়ারের এক খুড়তুতো ভাইকে জবরদস্তি ধরে এনে সিংহাসনে বসিয়ে কুর্ণিশ ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।...খেলার কোন অঙ্গ তো বাদ দেওয়া যায় না।

অন্ধ ফারুকশায়ার কয়েদখানা থেকে এক কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন নূতন সম্রাটকে।

'হে আমার নতুন বুলবুল,
বাগিচার মালীর আদরে ভুলোনা।
ঐ মালঞ্চে একদিন আমারও
বড় সাধের বাসা ছিল।'

অরসিক হুসেন আলির হাতে ঐ কবিতা গিয়ে পড়লে কবিকে তিনি প্রাণদণ্ড দিলেন।...

ফারুকশায়ার ছিলেন গুণগ্রাহী ব্যক্তি। কারো ললাটে গুণের বিভূতি দেখলে তাকে পরম সমাদর ক'রতেন।

আজকের দিনে ফারুকশায়ারের গুণগ্রাহিতার দু'টি উদাহরণ মনে পড়ছে যার ফল হ'য়েছিল সুদূরপ্রসারী।

বাদশা ফারুকশায়ারের সঙ্গে যোধপুর রাজকন্যার বিয়ের সব ঠিকঠাক। এমন সময় কঠিন অসুখে শয্যাগত হ'লেন তিনি। দরবারের হাকিম বৈদ্যেরা একে একে হার মান্‌লেন। জীবনের কোন আশা নেই। তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দূতাবাসের উইলিয়ম হ্যামিল্‌টন্‌ নামে জনৈক চিকিৎসককে ডেকে আনা হ'ল শেষ চেষ্টা করার জন্য। তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ ক'রে বাদশা বিয়ে ক'রে এলেন্‌। তারপর হ্যামিল্‌টন্‌কে দরবারে মর্যাদার আসন দিয়ে তাঁকে প্রচুর ধন-দৌলত উপহার দিতে চাইলেন। হ্যামিল্‌টন্‌ সে সব প্রত্যাখ্যান ক'রে শুধু প্রার্থনা ক'রলেন তাঁর স্বদেশীয় কোম্পানির জন্য চব্বিশ পরগণায় জমিদারি কেনার ফরমান। ১৭১৭ সালের জুন মাসে এই ফরমান তিনি লাভ করেন। এই জমিদারির বীজ থেকেই এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহীরুহ জন্ম নেয়।

দ্বিতীয় ঘটনা হ'ল ফারুকশায়ার একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে সঙ্গে ক'রে দিল্লীতে নিয়ে এসে জায়গির দিয়ে বাস করান। এই ব্রাহ্মণের নাম রাজ কাউল। এ'রই বংশধর হ'লেন আমাদের সর্বজনপ্রিয় পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু।

…বাহাদুর শাহের পৌত্র রোশন অখ্‌তর সম্রাট্ হন্, মুহম্মদ শাহ্ নামে। নিজাম বাহাদুর তাঁর প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন। এতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে নিজামকে শাস্তি দিতে দাক্ষিণাত্যে এসে দু'ভাই-ই মারা পড়লেন। তখন নিজাম বাহাদুরকে পায় কে ? পুতুল নাচ দেখাবার জন্যে তাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ আর কেউ রইল না।…

চিন্ কিলিচ্ খানের সব চেয়ে বড় কীর্তি হ'ল খাল কেটে কুমীর আনা।

মেছো কুমীর নয়। মানুষ খেকো।

বাদশা মুহম্মদ শাহের উপর অভিমান ক'রে তিনি খাল কেটে কুমীর এনেছিলেন।

কুমীর নাদির শাহ্। পৃথিবীর বিভীষিকা।

## ॥ তেরো ॥

নাদিরের ধমনীতে এক বিন্দুও নীল রক্ত ছিল না। স্রেফ লাল রক্ত।

বাপ ইমামকুলি ইমানদার লোক। খোরাশানের বাসিন্দা। শীতের দেশে ভেড়ার চামড়ার জোব্বা ও টুপি তৈরি ক'রে দিন গুজরান করে।

ছোট্ট এতটুকু নাদির কুলি ভেড়া চড়ায় পাহাড়ের ধারে ধারে। আর পাহাড়ের ওপারের জগৎটাকে দেখার জন্যে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে গলা উঁচু ক'রে চেয়ে থাকে যতক্ষণ না পা দু'টো ব্যথায় টন্‌টন্ করে।

ভেড়া চড়াতে তার ভালোই লাগে। ভেড়া চড়ানোয় এমন তালিম পেয়ে যায় যে ভবিষ্যতে বহু দু'পেয়ে ভেড়াকে চড়াতে তার অসুবিধে হয়নি একটুও।

কৈশোরে একদিন একদল উজবেগ ডাকাত নাদিরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বছর চারেক আটকে রাখে। বুদ্ধি খাটিয়ে কোন রকমে ছাড়া পেয়ে নাদির দেশে ফিরে কতকগুলো শক্তসমর্থ ছোকরাকে নিয়ে এক ডাকাতের দল ক'রে সর্দার হ'য়ে বসে। সর্দারি করার জন্যই যেন তার জন্ম। তার বুদ্ধি আর শক্তির বহর দেখে দলের সবাই তাকে মেনে চলে।

সফাই বংশের অধীনে পারস্য এক বিশাল রাজত্বে পরিণত হ'য়েছিল। সে সময়ে প্রায় একশ' বছর ধরে দক্ষিণ আফগানিস্থান

পারস্য-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। কালক্রমে এই রাজবংশ দুর্বল হ'য়ে পড়ে। খিল্‌জাই ও আবদালী এই দুই পার্বত্য জাতি বিদ্রোহী হ'য়ে কান্দাহার দখল ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা পেয়ে তারা পারস্যে অভিযান চালায় এবং রাজধানী ইস্পাহান দখল ক'রে পারস্যে আফগান রাজত্ব কায়েম ক'রে।

বেশীদিন কিন্তু তারা পারস্যকে পদানত রাখতে পারল না। তাদের অত্যাচারে সাত বছরে দশ লাখ লোক মারা গেল। তাদের অত্যাচার যখন সীমাহীন হ'য়ে উঠেছে তখন 'হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু' এই বাণী কণ্ঠে নিয়ে একজন লোক সমস্ত পারস্যবাসীকে জাগিয়ে তুল্‌লেন। এই নব জাগরণের মন্ত্র নিয়ে জনতার পুরোভাগে তলোয়ার হাতে নিয়ে যিনি দাঁড়ালেন তিনি দস্যুদলপতি নাদির কুলি।...

দলে দলে চাষীরা তাঁর বিদ্রোহের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। নাদির তাদের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুল্‌লেন। অল্প সময়ের মধ্যে আফগানদের বিতাড়িত ক'রে পারস্যের সিংহাসনে বসলেন সেই ভেড়িওয়ালা নাদির কুলি। এখন শাহান শাহ্‌ নাদির শাহ্‌।

নাদিরের পৃথিবী দেখার সাধ আর পাহাড়-পর্বত নদনদী আড়াল ক'রে রাখতে পারে না। তাঁর চোখে সেকেন্দার শাহের মতো দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন। পদভরে মেদিনী কম্পমান।...

রাশিয়া, তুর্কীস্থান এবং আরব থেকে এক এক খাবল জায়গা তিনি অধিকার ক'রে নিলেন চোখের নিমেষে। তারপর আশি

হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপ দিলেন আফগানদের উপর। দখল ক'রলেন কান্দাহার।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য তখন ঘুণে ধরা। দিল্লীর সিংহাসনে দুর্বল বিলাসপরায়ণ অপদার্থ পুতুলরা একের পর এক ওটা নামা ক'রছেন।...

নাদির এই সুযোগে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রদেশ কাবুল দখল ক'রে নিলেন। হিন্দুস্থানের তোরণ কাবুল করায়ত্ত হতে না হতেই নাদির একখানি চিঠি পেলেন। একজন অশ্বারোহী গোপনে তাঁকে এই চিঠি দিয়ে গেল।

'পত্র পড়ি' নাদির উঠে হাসি',
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।'

তারপর পা বাড়ালেন দিল্লীর অভিমুখে।...

পত্র লেখক নিজাম-উল্-মুল্ক চিন্ কিলিচ্ খান্। তিনি নাদিরকে অনুরোধ করেছেন দিল্লী অধিকার ক'রে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহকে শিক্ষা দিতে। ভরসা দিয়েছেন যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত হ'য়ে তিনি সাগ্রহে দিন গুন্‌ছেন তাঁর শুভাগমনের।

খাইবার গিরিসঙ্কট পার হ'য়ে নাদির এগিয়ে চল্‌লেন। পেশোয়ার ও লাহোরের দুর্গ তাসের ঘরের মতো পড়ে গেল। গোটা পাঞ্জাবে হাহাকার উঠল।...ঘরে ঘরে লুণ্ঠিত হ'ল ধনরত্ন ও নারী। কর্‌নলে এসে ছাউনি ফেল্লেন নাদির। সঙ্গে এক লাখ ষাট হাজার পুরুষ ও ছ'হাজার নারী সৈনিক।

আসন্ন দুর্যোগ ঠেকাবার জন্যে দিল্লীতে মুঘল সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ উজীর আমীর ওমরাহদের ডেকে পরামর্শ সভা বসালেন।

রাজ্যে তখন দু'টি দল প্রধান। 'হিন্দুস্থান' আর 'তুরাণী'। দু'দলে মিল হ'ল না। সম্মিলিত প্রতিরোধে কেউ রাজী নয়। দলের স্বার্থের কাছে ভেসে গেল দেশের কল্যাণ।...

রাজপুতরা—যারা একদিন মুঘল-মস্‌নদের সবচেয়ে বড় রক্ষক ছিলেন—চুপ ক'রে রইলেন। আওরঙ্গজেবের উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় তাঁদের মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবলেন, 'বেশ হয়েছে। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'।

সম্রাটের তলব পেয়ে পেশোয়া বাজী রাও বল্লেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। বাদশার এত বড় বিপদ। আমরা সাহায্য ক'রব বৈকি! এর আর কথা কি আছে?"

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু রাজপুতদের মতো মারাঠারাও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে রইলেন। শত্রুর ঘরে আগুন লাগলে যেমন চুপ ক'রে বসে থাকে মূর্খ প্রতিবাসী।...

গোপন মন্ত্রণা কক্ষে মুহম্মদ শাহ্ ডাকলেন, 'আসফ জাহ্'।

কুর্ণিশ ক'রে নিজাম বল্লেন, 'গরীব-পরবর'।

"এখন উপায়?"...

"উপায়?...উপায় তো কিছু দেখছিনা জাঁহাপনা। এক আমার জান দিয়ে যদি..."

"তোমার একার জ্ঞান দিয়ে তো কোন ফল হবে না। একটা উপায় ঠাওরাও।"

"একমাত্র উপায় আছে। সন্ধি। টাকা দিয়ে দস্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া।"

"নাদির যদি মস্‌নদে বসতে চায়, আমি বসব কোথায় ?"

"কিছু ভাববেন না জাহাঁপনা। নাদির কি বাদশাজাদা আপনার মতো ? সিংহাসনে সে লোভ ক'রবে না। ডাকাত। আশরফি আর আওরত পেলেই চলে যাবে।"

"তাহলে সেই ব্যবস্থাই কর।"

"জো হুকুম খোদাবন্দ। তবে অধীনের দৌত্যের বক্‌শিশ উজীরিটা ভুলবেন না দুনিয়ার মালিক। শয়তান অযোধ্যার নবাবের আবার ঘুম নেই উজীরের গদিটার জন্যে।"

## ॥ চোদ্দ ॥

শালিমার বাগিচা থেকে দিল্লীর লাল কেল্লা পর্যন্ত কাতারে কাতারে সৈন্য দাঁড়াল। সোনার কাজ করা মখমলের গালিচা বিছান হ'ল সমস্ত পথটা। আতর গোলাপজল আর ফুলের সমারোহের মধ্যে বিজয়-গৌরবে এগিয়ে এলেন নাদির। দুর্গ তোরণে আভূমি নত হ'য়ে বৃদ্ধ বাদশা মুহম্মদ শাহ্ তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে স্বাগত ক'রলেন। মসজিদে 'স্বর্গ মর্ত্যের অধীশ্বর' 'ইস্‌লামের রক্ষক' 'বাদশার বাদশা' নাদিরের নামে খুৎবা পাঠ করা হ'ল।

নাদির প্রাসাদে গিয়ে যা দেখেন তাতেই অবাক হ'য়ে যান। পারস্যের সম্রাট্ হ'লেও এত ঐশ্বর্য এত আড়ম্বর তাঁর চর্মচক্ষে কখনও পড়েনি। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত দুর্যোধনের মতো তাঁর অবস্থা!

'দেওয়ান-ই-আম'এ গিয়ে তিনি শাহ্-জাহানের ময়ূর সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসলেন। নূরজাহানের গোলাপ জলের চৌবাচ্ছায় স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হলেন। পান-ভোজনের সময় গৃহকর্তার মতো ব্যবহার ক'রে মুহম্মদ শাহ্‌কে রাজ্যশাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে বকাঝকা ক'রে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তারপর মমতাজমহলের কক্ষে হাতির দাঁতের পালঙ্কে বিশ্রাম ক'রতে গেলেন। সম্রাট্ ও আমীর-ওমরাহদের হারেমের সেরা সুন্দরীরা তাঁর চিত্ত বিনোদন ক'রল।...

পরদিন প্রাণ আর সাম্রাজ্য যাবার আশঙ্কা নেই জেনে মুহম্মদ শাহ্ নাদিরকে মুঘল বাদশাদের বংশপরম্পরায় সঞ্চিত ধনরত্নগুলি উপহার দিলেন। না দিয়ে উপায় ছিল না। তোশাখানার চাবি নাদির আগেই নিয়ে রেখেছিলেন।

নাদিরের বেশ হাসিখুশি ভাব। এমন সময়...

"প্রাসাদের একজন নারীরক্ষী নাদিরকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে"—সন্ধ্যার দিকে কি ক'রে যেন এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

গুজব বাতাসের আগে ছোটে।

অনেকেই গুজবটায় বিশ্বাস ক'রে অত্যাচার আরম্ভ ক'রল নাদিরের সৈন্যদের উপর। সৈন্যেরা রাস্তাঘাটে ফূর্তি ক'রে বেড়াচ্ছিল। যে যেখানে পারল তাদের আক্রমণ ক'রল।

খবর পেয়ে নাদির সৈন্যদের অবিচলিত ভাবে নিজের নিজের ঘাঁটি আগলে থাকতে আদেশ দিয়ে বিশ্রাম ক'রতে গেলেন। কিন্তু সারারাত চলল এই দাঙ্গা। প্রায় ন'শো পারসীক সৈন্য প্রাণ হারাল। তারিখটা হ'ল ২২শে মার্চ, ১৭৩৯।

পরদিনটা ছিল হোলি উৎসবের দিন।

সূর্যোদয়ের পরও দাঙ্গা থামার নাম নেই। বরং বেড়েই চলেছে।...নাদির বর্মে সজ্জিত হ'য়ে দেওয়ান-ই-আম থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রজাদের দর্শন দিয়ে গুজব মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য বাজারের মাঝখানে নবনির্মিত সোনা-মসজিদের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। জনতাকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন।

এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল।

পাশের এক বাড়ি থেকে একটি পিস্তলের গুলি নাদিরের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হ'ল। নাদির অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। আহত হ'ল তাঁর একজন দেহরক্ষী।

আর যায় কোথা ?...

জ্যামুক্ত ধনুকের মতো সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন নাদির। বিচিত্র হাসি খেলে গেল তাঁর কঠিন মুখমণ্ডলে। কোষমুক্ত ক'রে তরবারি তুলে ধরলেন তাঁর সৈন্যদের সামনে। ইঙ্গিত বুঝতে বিলম্ব হ'ল না তাদের।

নিমেষে দিল্লীবাসীদের উপর সুরু হ'ল যে অমানুষিক অত্যাচার ইতিহাসে তার জোড়া নেই।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে চল্‌ল নির্ম্ম হত্যা। বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল তারা। স্ত্রীলোকদের উপর চল্‌ল অকথ্য অত্যাচার। শত সহস্র স্ত্রীলোক অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কূপে লাফিয়ে পড়ল। অনেকে স্ত্রী-কন্যাদের হত্যা ক'রে আত্মহত্যা ক'রল। বহু নর-নারীকে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল ক্রীতদাসরূপে দেশ-বিদেশের বাজারে-বন্দরে বিক্রি করা হবে বলে।

হোলির দিন। লাল হ'য়ে গেল দিল্লী ও সহরতলীর পথঘাট। আবীর কুঙ্কুমে নয়—মানুষের তাজা রক্তে।...

নতজানু হ'য়ে মুহম্মদ শাহ্‌ নাদিরের কাছে ভিক্ষা ক'রলেন তাঁর মূর্খ প্রজাদের প্রাণ।

অবশেষে নাদির প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে সৈন্যদের আদেশ দিতেই

থেমে গেল হত্যাকাণ্ড। সুরু হ'ল পাইকারী জরিমানা। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে।

সকাল আটটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত চলেছিল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। 'জাহান-কুশা-ই-নাদিরী'র মতে এই সাত ঘণ্টার মধ্যে তিরিশ হাজার লোক নিহত হ'য়েছিল। আবার কারো কারো মতে এই সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার অথবা দেড় লাখ।

চিন্ কিলিচ্ খানের নিমন্ত্রণে এসে হোলি খেলে গেল পারস্যের সৈন্যদল।...

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে।

ফিরে যাবার জন্যে হাতিতে উঠে বসলেন নাদির। রত্ন আভরণ ছাড়া সঙ্গে নিলেন তিরিশ কোটি টাকা, এক হাজার হাতি, সাত হাজার ঘোড়া, দশ হাজার উট, একশ' খোজা ক্রীতদাস। আর ময়ূর-সিংহাসন।

তবু সুখ নেই নাদিরের মনে। দুনিয়ায় মসহুর কোহিনূর হীরক মুহম্মদ শাহের উষ্ণীষে রয়েছে। সেটি কি ক'রে বাগানো যায় সেই চিন্তায় মন খারাপ।...

হাতি থেকে নেমে এসে মুহম্মদ শাহ কে বল্লেন, "ইস্, একটা বড় ভুল হ'য়ে যাচ্ছিল দোস্ত।...ভব্যতায় ভয়ানক ত্রুটি থেকে যাচ্ছিল। ...লোকের কাছে মুখ দেখাতাম কি ক'রে? আসুন বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমরা পরস্পরের সঙ্গে পাগড়ি বদল করি।"

একটা ঢোক গিলে মুহম্মদ শাহ্ বল্লেন, "বিলক্ষণ...তা...আ

আমারই ভুল... ।”

পাগড়ি বদল হ’ল দুই বন্ধুতে।

মুহম্মদ শাহ্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরে নাদির তাঁকে বল্লেন, “আপনার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ’লাম।”···তারপর নিম্নকণ্ঠে বল্লেন, “আপনি কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন নিজাম চিন্‌ কিলিচ্‌ খানের কাছ থেকে।···ওঁর নিমন্ত্রণেই আমরা এখানে এসেছিলাম।...আপনার ঐ তাঁবেদারটি যেমন খল, তেমনি শয়তান।···প্রজার অত বেশী উচ্চাকাঙ্খা থাকা ভাল নয় রাজার পক্ষে।···আচ্ছা আসি। খোদা হাফিজ।”

দেশে ফিরে নাদির নাকি তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে বলেছিলেন, “জীবনে আমি দু’টো ভুল ক’রেছি। প্রথম, মেরুদণ্ডহীন মুহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে। দ্বিতীয় শঠ চিন্‌ কিলিচ খানকে হত্যা না ক’রে।”

নিজাম বাহাদুরের কানে কথাটা গেলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস কণ্ঠে বলেছিলেন, “দুনিয়ায় কারো ভাল ক’রতে নেই। নাহলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।”

॥ পনরো ॥

"বরাবর একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে আসছি,"···মুরগীর একটি ঠ্যাংকে কাবু ক'রতে ক'রতে ভোজনপর্বের মাঝখানে গভীর দার্শনিকের মতো বলে উঠলেন মোমসাহেব,···"ভাল খাওয়া দাওয়া হলে মনটাও বেশ ভাল থাকে।···হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি বেশ যেন তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে।"

মনে মনে বিরিয়ানীর খোশবাই'এর তারিফ ক'রতে ক'রতে এই মৌলিক গবেষণামূলক সত্য আবিষ্কারের স্বীকৃতিতে মোমসাহেবকে একটা 'পদ্ম-বিভূষণ' দেওয়ার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা যায় কিনা ভেবে দেখছিলাম।

"আজ সন্ধ্যা থেকেই বেশ ঠাণ্ডা, কি বলেন?"

পাশের টেবিল থেকে ইংরেজীতে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ ক'রলেন পার্সী ভদ্রলোকটি। লক্ষ্য আমাদের টেবিল।

এক টুকরো মাংস মুখের মধ্যে দ্রুত চালান ক'রে দিতে দিতে মোমসাহেব অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলেন, "তা মন্দ কি?"

আওরঙ্গাবাদ গেস্ট হাউসের খাবার ঘরে গোটা পাঁচেক টেবিল। তারই একটা দখল ক'রেছি আমরা তিনজন। পাশেরটায় এক পার্সী ভদ্রলোক এবং এক মহিলা। তাঁর কন্যা বলেই ভুল হয়। পরে পরিচয়ে জেনেছিলুম তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোকের 'কনং ত্রয়োদং'-এর বয়স। দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন পুরুষ।

ট্রাউজার ও বুশশার্ট পরণে। মহিলাটি সুন্দরী না হলেও বেশ সুশ্রী। বয়স বাইশ তেইশ। মেয়েদের বয়স উল্লেখ করা অমার্জনীয় হ'লেও অনুমান ক'রতে দোষ নেই। কারণ অনুমান সব সময় নির্ভুল হয় না।

কোণের দিকের টেবিলে এক স্থূলকায় বিরলকেশ গুজরাতী ভদ্রলোক। একা। তাঁর খাওয়ার বহর দেখে মেয়েদের বাক্স গোছান'র কথা মনে পড়ছিল। ভাল ভাবে ঠিক কতখানি ধরে সেটা বড় কথা নয়, যে-ভাবেই হোক কতখানি আঁটানো যায় সেটাই মুখ্য।

"অজন্তা-ইলোরা দেখতে এসেছেন বুঝি? ট্যুরিস্ট?"—প্রথম পরিচয়ের বরফ ভাঙার পর আরম্ভ ক'রলেন সেই পার্সী ভদ্রলোক।

"হ্যাঁ, আপনারাও?"

"ট্যুরিস্ট ঠিকই, তবে আপনাদের মতো পুরাতত্ত্বের প্রেমিক নয়। অজন্তার পুরানো ছবি দেখতে আসিনি। এসেছি নতুন ছবি দেখাতে। এখানকার হাউসে আমার ছবি রিলিজ ক'রতে। আমি বম্বের একজন ফিল্ম প্রডিউসর। নাম ওয়াদিয়া। ইনি মিসেস ওয়াদিয়া।"

পরিচয়পর্ব সমাপ্ত হ'ল নমস্কার ও পদবী বিনিময়ে।

"বাঙালী?...কোলকাতা থেকে আসছেন?"

"বাঙালী ঠিকই। আপাতত আসছি বম্বে থেকে।"

স্ত্রীর গ্লাস ভ'রে দিয়ে নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে মিস্টার ওয়াদিয়া প্রশ্ন ক'রলেন, "কৈ, আপনারা তো পানীয়

কিছু নিলেন না ?”

“নিয়েছি বৈকি !”

জলের গ্লাস তুলে দেখালাম।

“না। ও পানীয় নয়। ড্রিঙ্কস্। মানে···আই মিন্···” কথাটা অসমাপ্ত রেখে হাসলেন মিস্টার ওয়াদিয়া। “আমার কাছে ভাল জিনিস রয়েছে। গ্রহণ ক’রলে বাধিত হব।”

“ধন্যবাদ। ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস।···”

সবিনয়ে জবাব দিলাম।

শ্রীমতী ওয়াদিয়া হেসে বললেন, আপনারা—বাঙালিরা—বড় ভাল ছেলে। ত্রিবাঙ্কুর আর বাঙ্‌লা দেশের ছেলেমেয়েরা খালি লেখাপড়া ক’রতেই জানে।”

“স্পিরিট না খেলে যদি ভাল ছেলে হয় তাহলে আমরা অল্প-বিস্তর ভাল ছেলে একথা স্বীকার না ক’রে উপায় নেই। ‘পান-ভোজনের’ মধ্যে ভাগাভাগি ক’রে আপনারা পানটা নিয়েছেন। আমরা নিয়েছি ভোজন। ব্যালান্স ঠিকই আছে।”

“আমাদেরও আর ক’দিন ? পূরো প্রহিবিশন এলো বলে। এখন বম্বেতে স্বাস্থ্যের অজুহাতে পারমিট নিয়ে পান ক’রতে হ’চ্ছে। পারমিটও উঠে যাবে শিগ্‌গীর,” সখেদে বল্লেন মিস্টার ওয়াদিয়া, “মোরালজী আমাদের সুবোধ বালক না ক’রে ছাড়বে না।”

“তখন যাব দামন আর গোয়া। আওরঙ্গাবাদও আসবো মন্দ মন।” নীরবতা ভঙ্গ ক’রে কোণের টেবিলের সুরকার গুজরাতী

ভদ্রলোকটি গর্জে উঠলেন। তাঁর সোনা বাঁধান সামনের দাঁত দু'টি ঝক্‌মক্‌ ক'রে উঠল। "যত সব গবেট মন্ত্রী হ'য়ে বসেছে। কেউ কিছু ভাবে না। ভেবে দেখে না…।"

তিক্ততায় মিস্টার জবেরীর মুখ বিকৃত হ'য়ে উঠল।

"ঠিক উল্‌টো। গলদ তো ঐখানেই। ওরা শুধু ভাবে তাই নয়—একটু বেশী ক'রে ভাবে। আর সব চেয়ে সাংঘাতিক ক'রে তোলে যখন শুধু ভাবে না, যুক্তি দিয়ে ভাবে। ভাল মন্দ সাদা কালো সব আলাদা আলাদা ভাগ ক'রে চুল চেরা প্রিন্সিপল্‌স্‌ গড়ে তোলে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে রাখে কাগজে-কলমে। …একটি জাত ভাবে না। সে ইংরেজ।" ওয়াদিয়া বলে চল্লেন, "বেশী ভাবতে হয় না ইংরেজদের। কারণ ওদের কমনসেন্স খুব প্রখর। ইংরেজ খুব গোঁড়া জাত। তবু প্রিন্সিপল্‌স্‌'এর বাঁধনে কমনসেন্সকে পদে পদে পঙ্গু করে না। জীবনের চাহিদা ও স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সমতা রেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। তাই জাতটা অত উন্নত।"

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না—।" প্রশ্ন ক'রলাম।

"এই ধরুন আমাদের সংবিধান। হেন গালভরা বুলি নেই যা ওতে লেখা নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখবেন সব ধোঁয়া। আর ইংরেজদের কনস্টিটিউশন্‌ বলেও কিছু আছে নাকি? অথচ ওদের চেয়ে ভাল কনস্টিটিউশন্‌ কোন দেশে আছে বলুন? সে নিয়ে কত গর্ব ওদের।…ওরা জাতটাকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর লোকগুলো চার্বাকের নীতি অনুসরণ ক'রবে না মোহমুদগর

আওড়াবে সে নিয়ে স্টেট মাথা ঘামায় না। তারা জানে মনুর ধর্মের চেয়ে মানব-ধর্ম বড়। চরিত্রের উপর পুলিস কড়া নজর রাখলেই চরিত্রের বিকাশ হয় না বলেই আমার ধারণা।" একটু থেমে বল্লেন, "একটা গল্প পড়েছিলুম। বোধকরি কোন ইংরেজেরই লেখা। মহিলারা অনুমতি দিলে পেশ ক'রতে পারি,—আমার বক্তব্যকে বিশদ করার জন্যে।...গল্পটি ঠিক নিরামিষ নয় তাই দ্বিধা বোধ ক'রছি।···অনুমতি দিচ্ছেন? আচ্ছা, তবে শুনুন।...এক গ্রামে এক ইংরেজ পাদ্‌রী সাহেব ছিলেন। একবার তাঁর উপর-ওয়ালা এক স্কটিশ বিশপ তাঁর গ্রাম পরিদর্শন ক'রতে গিয়ে দেখলেন যে কাজকর্ম সব বেশ ভালই চল্‌ছে। তবে পাদ্‌রীটি ছোট্ট একটা বাড়িতে তরুণী গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে একই বিছানা ভাগাভাগি ক'রে রাত কাটান।

"এই আবিষ্কারে বিশপ চিন্তিত হ'য়ে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রলে পাদ্‌রী তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন যে এ বিষয়ে ভাবনার কোনই হেতু নেই। কারণ রোজই রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় তিনি ঐ মহিলা ও নিজের মাঝখানে খাটের উপর একটি পাশ-বালিশ আড়াল দিয়ে দেন।

"বিশপ কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। 'কিন্তু বাছা,' তিনি চিন্তিতভাবে প্রশ্ন ক'রলেন, 'যদি মনে কোন পাপ প্রলোভন আসে তাহলে কি কর?'

"তাহলে," ধীরভাবে জবাব দিলেন পাদ্‌রী, "ঐ আড়াল করা বালিশটা বিছানা থেকে সরিয়ে দিই।..."

আশা করি আপনারা পরমহংসের মতো গল্পের নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিতে পেরেছেন।"

এই বলে ওয়াদিয়া থামলেন।

"বাঙ্‌লা দেশে থাক্‌লে আপনাদের ক্ষোভ মিটতো। সেখানে প্রহিবিশন হয়নি এখনও।" হেসে বল্লেন মোমসাহেব।

"ভাবছি, নেশার দাম দিতে আপনারা একদিন যেমন দেশ ছেড়েছিলেন, তেমনি দেশত্যাগী হব।"

"নেশার জন্যে আমরা আবার বিবাগী হলুম কবে ?"—মোমসাহেব কৌতূহল প্রকাশ ক'রলেন।

"হন্‌নি ?...আপনারা—মানে ভারতীয় আর্যেরা ?" ওয়াদিয়া বলে চল্লেন, "হাজার হাজার বছর আগে আর্যভাষাভাষীরা পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে দুটো দল হ'য়ে যায়। একদল যাজ্ঞিক। ক্রিয়াকাণ্ডবাদী। তাঁরা সোমক বা সোমরস পান ক'রতেন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে উৎসর্গ ক'রে। সোমক কারো মতে সিদ্ধির পাতা, আবার কেউ বলেন দ্রাক্ষারস। নোয়া আর শয়তান উভয়ের পরিচর্যার ফল। বিষামৃত !...মাদক বিরোধীরা সোমরসের বিপক্ষে। তাঁরা ক্ষমতা হাতে ক'রে ক'রলেন আজকের মতো প্রহিবিশন্‌।...সোমরসের পৃষ্ঠপোষকরা তাদের 'অসুর', 'দস্যু' বলে গালাগালি দিয়ে মৈরেয় ভাণ্ড কাঁধে ফেলে জম্বুদ্বীপে এসে আস্তানা গাড়লেন।...আমরা—জরথুস্ত্রী পার্সীরা—সেই যজ্ঞাগ্নির উপাসনাই ক'রে আসছি। ধূমপান ক'রে অগ্নির অমর্যাদা করা আমাদের শাস্ত্রে বারণ। আমরা সোমরস

আস্বাদ ক'রেছি অনেক পরে। উপলব্ধি ক'রেছি উপাদেয় বস্তু। এই জ্ঞান তখন হ'য়ে থাকলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে ফারাক হতাম না।..."

"দেখুন না, কোল্‌কাতায় প্রহিবিশন্‌ নেই বলে কি সবাই মদ খেয়ে বেহেড হ'চ্ছে?" তারপর একগাল হেসে বল্লেন, "জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের ঐ তো এক তফাত। জানোয়ার নিয়মিত নেশা করে না। মানুষেরই নেশা আছে।"

"মানুষের একটা অভিনব সংজ্ঞা পেলুম," মোমসাহেব বল্লেন, "তবে বাঙ্‌লা দেশে ড্রিঙ্কসের অভ্যাস হ'ল সমাজের উচ্চকোটি আর নিম্নশ্রেণীর। স্বর্গের পুরন্দর ও পাতালের বলির। তারা যথাক্রমে সাদা ঘোড়া এবং ধান্যেশ্বরীর উপাসক। ত্রিশঙ্কুরা অর্থাৎ মর্ত্যের মধ্যবিত্তেরা যে অভ্যাস করেনি সেটা স্বভাবে নয়, অভাবে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, তার আবার নেশার বিলাসিতা? তাই আমরা আপনার সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ হ'তে পারিনি। জানোয়ারই রয়ে গেছি।...জানোয়ার বলেই অন্ন-চিন্তায় দিন কাটে, অন্য-চিন্তার সময় কোথা?"

মিস্টার ওয়াদিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কথাটা আমি পরিহাস ক'রে বলেছি। অন্যায় হ'য়ে থাকলে মার্জনা ক'রবেন।...তাছাড়া নেশা বল্‌তে আমি শুধু সুরা বলছি না। আপনাদের পবিত্র গঙ্গা নদীর যেমন ত্রিধারা,—স্বর্গে তিনি মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী, তেমনি নেশাও চর্ব্য, পেয় ও শ্রেয়।...এছাড়াও অবর নেশা আছে। যেমন, ত্যাগ করার নেশা,

লেখাপড়ার নেশা, টাকা রোজগারের নেশা, প্রেমে পড়ার নেশা আর যত্তোরকম hobby—এর যে-কোন একটা আর সব নেশাকে ফিকে ক'রে দেয়। জানোয়ারের সে বালাই নেই। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই নেশাগুলি এক একটি রোগ বিশেষ। ক্যানসারের মতো শিবের অসাধ্য ব্যাধি।”

শ্রীমতী ওয়াদিয়া স্বামাকে বল্লেন, “এবার তুমি থাম তো।” তারপর আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন, “ওঁর ঐ দোষ। কথা বল্‌তে আরম্ভ ক'রলে আর থামতে চান্ না। আমাকে ওঁর জন্যে মাঝে মাঝে এমন লজ্জায় পড়তে হয়। যে কোন বিষয় নিয়েই বক্তৃতা জুড়ে দেন এমন··· ।”

ব্রাহ্মণী সান্ত্বনার সুরে বল্লেন. “দোষ বল্‌ছেন কেন ? যে-কোন বিষয় নিয়ে ভাল কথা বল্‌তে পারা তো মহৎ গুণ।···আমি দু'জন লোকের কথা শুনেছি, যাঁরা যে-কোন বিষয় নিয়েই চমৎকার বক্তৃতা ক'রতে পারতেন বলে ভুবন বিখ্যাত হ'য়েছিলেন।

“কে তাঁরা ? শ্রীমতী ওয়াদিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রলেন, “বলুন না তাঁদের কথা।”

“একজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। অপরজন কথা-শিল্পী অস্কার ওয়াইল্ড্। কেশবচন্দ্র যেমন সৌম্যদর্শন তেমনি মেঘমন্দ্র তাঁর কণ্ঠস্বর।···তিনি তখন বিলেতে। যে-কোন বিষয়ে তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন শুনে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। বহু জ্ঞানীগুণী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় আগে কেশবচন্দ্রকে জানান হয়নি।

ঠিকও হয়নি কিছু। সভার আরম্ভে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠে গিয়ে সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লিখলেন একটি জিরো—শূন্য।···কেশবচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। আরম্ভ ক'রলেন, 'লেডিস্ এণ্ড জেণ্টল্‌মেন, ইন দি বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ নথিং—জিরো···" এই ভাবে ঝাড়া দেড় ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে একেবারে নিরাকার পরমব্রহ্মে গিয়ে উপনীত হ'লেন।···বক্তৃতা শেষ হতেই প্রচণ্ড করতালিতে হলঘর ভেঙ্গে পড়ে আর কি!"

"অস্কার ওয়াইল্ড্?" প্রশ্ন করলেন শ্রীমতী ওয়াদিয়া।

"অস্কার ওয়াইল্ডের অনেক গল্প আছে। অনেকেই জানেন সেগুলো। আমার এখন যেটা মনে পড়ছে সেটা বলি।···'এক ভদ্রমহিলা একবার এক ভোজের আসরে অস্কার ওয়াইল্ড্‌কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে এটা কি সত্যি যে তিনি যে-কোন সম্ভাব্য সাব্‌জেক্টে তখনই বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা দিতে পারেন। ওয়াইল্ড্ ছিলেন তুখড় লোক। বাক্‌যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলে কখনও পিছু হট্‌তেন না। চমকপ্রদ কথা বলার কোন সুযোগ অবহেলা ক'রতেন না। তিনি সোজা হ'য়ে বসে বল্লেন, "খুব সত্যি। আমাকে একটা সাব্‌জেক্ট দিয়ে এখুনি পরীক্ষা ক'রতে পারেন।"

"কুইন ভিক্টোরিয়া।..."

বলে মহিলাটি ভেবেছিলেন ওয়াইল্ড্‌কে খুব ফাঁদে ফেলেছেন। তিনি মহামান্যা স্বয়ং মহারানী সম্বন্ধে কোন বেফাঁস কথা বলতে পারবেন না। বিশেষ ক'রে সেই ভোজের আসরে।

"মাই ডিয়ার লেডি, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইল্ড্ বলে উঠলেন, "দি

কুইন্ ইজ নট এ সাব্জেক্ট।"

হাসির রোল পড়ে গেল ঘরে। বিষম খেতে খেতে দৈবাৎ সামলে নিয়ে শ্রীমতী ওয়াদিয়া "আরো একটা গল্প বলুন" বলে বায়না ধরলেন।

ব্রাহ্মণী নিঃশব্দে মোমসাহেবের দিকে ইঙ্গিত ক'রলেন।

সকলে তাঁকে চেপে ধরলে তিনি বল্লেন, "আমি গল্প বল্‌তে পারি না। গল্প ক'রতেই ভালবাসি।" তারপর একটু থেমে বল্লেন, "আপনারা কোল্‌কাতা গেছেন?"

তিনজনেই জানালেন গেছেন।

"কোলকাতায় রিক্‌শ দেখেছেন?...মানুষে গাড়ি টানে?... এক মার্কিণ মহিলা কোল্‌কাতা, ক্যাণ্টন, টোকিও প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ ভ্রমণ ক'রে দেশে ফিরে এক ভোজসভায় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন, 'প্রাচ্য দেশে রিক্‌শ বলে এক রকম গাড়ি আছে। তার ঘোড়ার মুখগুলো অবিকল মানুষের মতো।'...হাসবেন না। তিনি মিথ্যে বলেন নি। আপনি জানোয়ারের কথা বলছিলেন না? এরা জানোয়ার ছাড়া কি? জানোয়ারের সঙ্গে তাদের তফাত নেশায় নয়, আইনে। জানোয়ার গাড়ি টানতে টানতে রাস্তা নোংরা করলে দোষ নেই,—এরা পাঁচ আইনে পড়ে। তফাত ঐটুকু।...তাছাড়া কত মানুষ যে পশু হ'য়ে গেছে। হ'য়ে যাচ্ছে দিন দিন। না হ'য়ে উপায় নেই। পেটের দায়ে হ'চ্ছে।"

শ্রীমতী ওয়াদিয়া বল্লেন, "তাতে আর সন্দেহ কি? অতবড়

যেমিন হ'ল আপনাদের মুলুকে। ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে পশু হ'য়ে গিয়েছিল বলেই তো? চালে কাঁকর মিশিয়েছে, আটায় তেঁতুলের বীচি, চিনিতে কাঁচের গুঁড়ো, ঘিয়ে চর্বি, ওযুধে ভেজাল।...এ তো বম্বেতেও কম হ'চ্ছে না। মানুষ সত্যিই পশু হ'য়ে যাচ্ছে। Need, greed and speed এর যুগে এটা ঠেকান যাবে না, যদি না সমাজের কাঠামো বদলান যায়।"

"আমি কিন্তু তাদের কথা বলছি না যারা মুনাফার লোভে পশু হ'য়েছে। তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। আমি বলছি তাদের কথাই যারা মুনাফার শিকার হ'য়েছে। বাঙ্লা দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার ছেলের দল। যাদের ব্যবসার বুদ্ধি থাকলেও পুঁজি নেই। চাকরির বাজারেও নেই মুরব্বীর জোর। 'আয়ের অঙ্কে অষ্টরম্ভা, ব্যয়ের খাতে অষ্টগুণ।'...গল্প শুনতে চাইছিলেন আপনারা। শুনবেন একটা গল্প? খুব করুণ গল্প। সময় হবে আপনাদের?"

গল্পের গন্ধ পেয়ে উঠে বসলেন ওয়াদিয়া জাবেরী কোম্পানি। আমরাও অবহিত হ'লাম।

## ॥ ষোল ॥

"'গল্পটি আমার শোনা", আরম্ভ ক'রলেন মোমসাহেব দি কেভ ম্যান, "তাই কতখানি দুধে কতখানি জল হলফ ক'রে বলতে পারব না। রঙ্ দেখে কিছুটা দুধ আছে বলেই আমার অন্তত মনে হ'য়েছে। খাঁটী দুধ খেতে যারা অভ্যস্ত তাঁরাই শুধু জিবের স্বাদে বলে দিতে পারবেন কতটুকু খাঁটী আর কতটা ভেজাল।... তা ভেজাল আর কিসে নেই বলুন ?"

"...বাঙ্লা দেশের এক শিক্ষিত বেকার যুবকের কাহিনী। বহুর মধ্যে অনন্য নয়। বহুর মধ্যে এক। এমন কত অসংখ্য যুবক আছে আমাদের দেশে। তাদেরই একজন।

"ছেলেটির নাম ধরুন সুকোমল। লেখাপড়ায় ভাল। পাড়া গাঁ থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কোলকাতায় পড়তে এল।... দেশে থাকবার মধ্যে সামান্য জমিজমা আর এক বিধবা পিসী।

"বাপ মা মরা ভাইপোকে অনেক কষ্টে মানুষ ক'রেছে। তাকে দূরে পাঠাতে পিসী কেঁদে আকুল। গাঁয়ের লোক পিসীকে বোঝাল, লেখাপড়া শিখে ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

"ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছিল সুকোমল। আর গোটা দুই ট্যুশনি জুটিয়ে নিয়ে মেসে থেকে কলেজে ভর্তি হল সে। খরচ-খরচা বাদে মাস গেলে পিসীকেও দু'পাঁচ টাকা পাঠায়। এমনি ক'রে বি. এ. পাস ক'রল অনার্স নিয়ে।

"পিসী বলে, 'তিন তিনটে পাশ দিলি, এবার একটা চাকরি বাকরি কর। তোর বিয়ে দিয়ে বউ আনি। আমি আর কতদিন ?'

"সুকোমল বলে, 'তুমি থাম পিসী। এখনি বিয়ে কিসের ? এম. এ. টা যদি ভাল ক'রে পাশ ক'রতে পারি তাহলে প্রফেসর হব। সারাজীবন পড়াশোনা ক'রে কাটাব। বউ নয়,—বই পেলেই আমি খুশী।···আর মোটে দু'টো বছর।—অনেক কষ্ট ক'রেছ তুমি। তারপর তোমাকে ভাল ক'রে রাখব।'

"স্বপ্ন দেখে সুকোমল।···না। শুধু অন্ন হ'লেই চল্‌বে না তার। অমৃতও তার চাই। নচিকেতার মতোই পার্থিব জিনিসে সেও ভুল্‌বে না। ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি। শুধু ভূমি নয়,—ভূমাও। শুধু জীবিকা নয়,—জীবন। মৃত্তিকা আর আকাশ। হাঙ্গার এ্যাণ্ড গ্রেট হাঙ্গার। অর্থ ও পরমার্থ দু'টোরই সমন্বয় না ক'রতে পারলে আবার জীবন ?...অধ্যাপক হবে সে। ভদ্র কাজের সঙ্গে পাবে প্রচুর অবসর। দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ ক'রবে সে।···সকল বিলাস-বৈভবের আকর্ষণ কাটিয়ে সে ডুব দেবে তার আত্মার গভীরে, যেখানে তার চিত্তদীপ জ্বল্‌ছে অনির্বান-শিখায়।···মরণশীল হ'য়েও উপলব্ধি ক'রবে মরণাতীত রহস্যকে।···

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে 'গ্র্যাজুয়েটরাই যে দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ' এই কথা

শুনে স্বপ্ন আরো মধুর ঠেকলো।"

"কিন্তু সংসারের আর পাঁচটা ভাল জিনিসের মতো মধুর স্বপ্নও ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণভঙ্গুর।"

"ইকনমিক্সে এম্. এ. পাস ক'রল সুকোমল। পরীক্ষার ফল হ'ল মধ্যম।

"মাস দুই না যেতেই একটা ট্যুশনি হাতছাড়া হ'য়ে গেল। মেসের খরচ চলা দায়। ওদিকে পিসীর অসুখ। ওষুধপথ্যের কি ব্যবস্থা হয়?"

"কলেজে কলেজে দরখাস্ত ক'রে বেশীর ভাগ জবাব পায় না। যে দু'-একটা ইণ্টারভ্যু পেল, গিয়ে জানল লোক আগে থাকতেই ঠিক হ'য়ে আছে। কেউ পাঁচ সাত মাস কাজও ক'রছে। তাকেই কনফার্ম করবার আগে একটা লোক দেখান ইণ্টারভ্যু। অন্য স্টেটে গিয়ে শুন্‌ল ধেমোশালিক না হ'লে কোন ভরসা নেই।

"স্কুল মাস্টারিও জোটে না। অধ্যাপনার আশা ছেড়ে মার্চেণ্ট আপিসে ধর্ণা দিতে লাগল সুকোমল। সর্বত্র গেটের সামনে লেখা 'নো ভেকেন্সি'। চাকরি খালি নেই কোথাও। ছাঁটাই হবে। যুদ্ধের বাজার আর নেই। মারোয়াড়ী সেরেস্তায় বলে, 'এম্-এ লেকে হম্ ক্যা করেগা? জুটকা ভাও জান্‌তা হ্যায়?'

"পাটের না হোক ডিগ্রির মূল্য বুঝতে পেরেছে সুকোমল। মুরব্বীর জোর না থাকলে মেরিট কি ক'রবে? তদ্‌বির করার কেউ না থাকলে তক্‌দীর খুলবে কি ক'রে?

"অকূল-পাথার কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে।

"'এম্প্লয়মেণ্ট এক্স্চেঞ্জ' ভরসা দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। পরিচিত অপরিচিত সকলে অযাচিত উপদেশ দেয়, 'ইয়ংম্যান মুষ্ড়ে পড়লে চলবে কেন? স্বাধীন দেশের তোমরাই তো ভরসা। কাজের ছোট বড় বেছ না। যা পাও লেগে পড়। ডিগ্নিটি অফ লেবার...'

"এমন সময় চোখে পড়ল এক বিজ্ঞাপন। বক্স নম্বর দেওয়া। 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক অবিলম্বে আবশ্যক, একটি অস্থায়ী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরির জন্য। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে সংবিধানের...ইত্যাদি।'

"তেত্রিশ কোটি দেবতার কৃপা ভিক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি দরখাস্ত ক'রে দিল সুকোমল। কলেজের অধ্যাপকদের প্রশংসা-পত্রের নকলও দু'চারখানা পাঠিয়ে দিল সঙ্গে।...দেবতারা বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। দু'দিন পরে জবাব এল। ইণ্টারভ্যু'র চিঠি।

"ঠিকানাটা দেখে একটু অবাক হ'লেও নির্দিষ্ট দিনে ধোপদোরস্ত জামা কাপড় পরে ঠিক সময়ের কিছু আগেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল সুকোমল। আর একবার প্রায় মুখস্থ হ'য়ে যাওয়া ইণ্টারভ্যুর চিঠিখানি পড়ল। তারপর গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে।

"জায়গাটা 'জু' গার্ডেন। সরকারী চিড়িয়াখানা।

"বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে অফিসের বারান্দায় সুকোমল

অপেক্ষা ক'রতে লাগল অধীরভাবে।...ভিড় নেই। তবে কি আর কারো চোখে পড়েনি বিজ্ঞাপনটা? না, সে একাই ইণ্টারভ্যু পেয়েছে?...'জয় মা কালী। একবার যেমন ক'রে হোক ঝুলিয়ে দাও মা।'

"কলেজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ ক'রেছে সুকোমল। অবস্থা বিপাকে সেই আজ ঘোর আস্তিক হ'য়ে পড়ল।

"বেয়ারা ফিরে এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল্‌ল সাহেবের খাস কামরায়। চল্‌তে চল্‌তে হৃদ্‌কম্পন দ্রুত হ'য়ে উঠল সুকোমলের। দূতীর সঙ্গে অভিসারিকা যেমন ক'রে প্রিয়-সন্নিধানে যায় তেমনি হৃদ্‌স্পন্দন। তেমনি স্বেদকম্প।...মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিল সে।

"তিনজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন টেবিল ঘিরে। সুকোমল গিয়ে নমস্কার ক'রতেই বসতে বল্‌লেন গম্ভীর ভাবে। কুলজি শুনলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রিডিং পডতে দিয়ে গলার স্বর পরীক্ষা ক'রলেন। চলিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। আমাদের দেশে যেমন ক'রে কনে দেখে অসভ্যতার চূড়ান্ত ক'রে।

"তারপর সামনের লোকটি, বোধকরি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বল্লেন, 'আপনাকে নিয়ে চলবে আমাদের।'—আনন্দে ছলাৎ ক'রে উঠল সুকোমলের বুকের রক্ত।...এই সে প্রথম শুনল যে সে কোন কাজের যোগ্য।...

"হ্যাঁ, আপনাকে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে...তবে কাজটা যেমন দায়িত্বপূর্ণ তেমনি কন্‌ফিডেনশিয়ল্' বলে চল্‌লেন

চেয়ারম্যান, 'প্রথমে আপনাকে টেম্পোরারি নেওয়া হবে। যদি সাক্‌সেস্‌ফুল হন তাহলে কনফার্ম করার কথা ভেবে দেখা হবে।—মাইনে দু'শো টাকা। তাছাড়া আউটফিট, ব্রেক্‌ফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার পাবেন। ঘর ভাড়াও লাগবে না।'

"শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এল সুকোমলের অবশ হৃদয়। ভগবান যখন দেন তখন এমনি ছাপ্পর ফুঁড়েই দেন। পিসিমাকে আজই টেলিগ্রাম ক'রে খবরটা দিতে হবে। চিঠি বড় দেরিতে যায়। অত বিলম্ব সহ্য হবে না সুকোমলের।

'আপনার আপত্তি না থাকলে কবে যোগ দিতে পারবেন?'

'আপত্তি?...যদি বলেন আজই।'

'বেশ আজই। কিন্তু কই কি কাজ ক'রতে হবে সে কথা তো জিগ্‌গেস ক'রলেন না?'

'বলুন, কি ক'রতে হবে?'

'কাজ বেশী নয়'। আরামের চাকরি। তবে আপনারা আবার আজকালকার ইয়ংম্যান। কাজের বাছ-বিচার বেশী। মান-অপমান বোধ বড় বেশী ঠুন্‌কো।...কাজটা হ'ল কি জানেন? এই অভিনয় করা। হিস্‌ট্রিয়নিক্‌ আর্ট।...মানে—মানে আমাদের একটা বাঘ অর্থাৎ কিনা রয়েল বেঙ্গল টাইগার হঠাৎ মারা গেছে। নতুন বাঘ আবার যে কবে পাওয়া যাবে তারও ঠিক নেই। খাঁচাটা—তার ঘরটা এখন খালি রয়েছে।...এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি চলছে যে লোকে বাঘ দেখার নির্দোষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'চ্ছে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যে। আমাদের দেশের খবরের

কাগজগুলো জানেন তো...একটা ছুতো পেলে অমনি উঠে বসে।...আমরাও তাই আর দেরি ক'রতে চাই না।...আগেকার বাঘের ছালটা রাখা হ'য়েছে যত্ন ক'রে। সেইটে হবে আপনার আউটফিট। মানে আপনার গায়ে ভাল ক'রে সেটা এঁটে দেওয়া হবে। আপনি বাঘ সেজে ঘরটার মধ্যে একটু ঘোরাফেরা ক'রবেন আর কি! যখন খুশি গিয়ে শুয়ে থাকবেন পাশের ঘরটায়। কেউ টের পাবে না। বন্ধু-বান্ধবেরা জানবে না। মাথা খাটাতে হবে না। প্রফেসরের মতো কতকগুলো অমনোযোগী ছেলে-মেয়ের কাছে বৃথা বক্‌বক্ ক'রে মরতে হবে না। বার কয়েক গম্ভীর গলায় হুম্ হাম্ ক'রতে পারলেই যথেষ্ট। মাস গেলে মাইনে পাবেন। সরকারী চাকরি।...ইউনিফর্ম তো পাবেনই। উপরন্তু বোর্ডিং লজিং ফ্রী। মজাসে থাকবেন।'

"নিজের কানকে বিশ্বাস হ'ল না সুকোমলের। সে কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে? চাকরি চাকরি ক'রে মাথা খারাপ হ'য়ে গেল তার?...

'পছন্দ হ'চ্ছে না বুঝি?' ডান দিকের ভদ্রলোক বল্লেন, 'এই তো আজকালকার ইয়ংম্যানদের দোষ। স্বাধীন দেশে কোন কাজকেই ছোট মনে করা অমার্জনীয় অপরাধ।...এ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্পিরিট নেই কারো। দেশের উন্নতি হবে কি ক'রে? আপনি না নেন্ কাজটা অপরে নেবে। মাঝখান থেকে বেকার থেকে যাবেন আর গবর্ণমেণ্টকে গালমন্দ ক'রে মীটিং ক'রবেন। তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? আপনাকে দেখে আমাদের পছন্দ হ'য়েছে। তাই এত

কথা বলা। নাহলে···'

"বেশ আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন তো···" বল্লেন শ্রীমতী ওয়াদিয়া।

মিস্টার ওয়াদিয়া বল্লেন, "হুইস্কি খেলাম আমরা, ঘ্রাণেই অর্ধ ভোজন হ'য়ে গেছে ওঁর। বেশ। তারপর ?"

"তারপর ? বিস্ময় হ'লেও বজ্রপাত নয়।···ঘোর কাটিয়ে উঠল সুকোমল। বল্‌ল, 'একগ্লাস জল পেতে পারি কি ?' গলাটা শুকিয়ে উঠেছে তার।

'জল কেন ? লেমনেড খান্ না। বোয়...'

"লেমনেড খেতে খেতে সুকোমল ভাবল, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা হবে না। অন্ন-সমস্যা তো ঘুচ্‌বে ? দেখাই যাক্‌না ক'দিন ক'রে। তাকে তো কেউ চিনে রাখবে না। তাছাড়া কি রকম যেন মজা লাগছে এই অচিন্ত্যনীয় চাকরির কথায়।...'বাঙ্‌লার বাঘ' আশুবাবুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? লুসিয়সের মতো গাধা হ'তে হয়নি এই ঢের।···ঈগল পাখী হ'তে চেয়ে ডাইনীর মন্ত্রে গাধা হ'য়েছিল লুসিয়স্। সে নিরীহ অধ্যাপক হ'তে চেয়ে বাঘ হ'ল।···

"পরের দিন ভোর রাত থেকেই সুকোমল বহাল হ'ল। কাজটা যত শক্ত ভেবেছিল ততটা নয়। ছেলেবেলায় যাত্রার আসরে মায়ামৃগ, জটায়ু, হনুমান সাজতে দেখেছে। তাদের চেয়ে কিন্তু অনেক নিখুঁত হ'য়েছে তার সাজ। মুশকিল হ'ল ইচ্ছা মতো

লেজটা নাড়া যায় না। টেনে বেড়াতে হয়।…'ছিনাথ বউরূপী'কে মনে পড়ল সুকোমলের। কৈশোরে 'শ্রীকান্ত' পড়ার সময় কত হেসেছে ঐ জায়গাটা পড়তে পড়তে। তাকেই যে একদিন 'ছিনাথ বউরূপী' হ'তে হবে কে ভেবেছিল সেকথা ?…

"তার আসল পরিচয় জানে সিলেক্‌শন বোর্ডের তিনজন। ঝাড়ুদার। আর যে খাবার দিয়ে যায় সে লোকটা। ব্যস্‌ এই পাঁচজন।

"খাঁচাটা পাক দিতে দিতে খাবার দেনেওয়ালাকে বল্‌ল, 'দেখো কাঁচা মাংস আর গরুর মাংসটা দিওনা'।

"মাংস আপনাকে দিচ্ছে কে ? আসল বাঘই পায়না তো আপনি! মাংস পেলে কি আগেকার বাঘটা মরতো ?…সব জানোয়ারের সামনে হাড্ডিটা ফেলে রেখে মাংসটা চালান হ'য়ে যায় যেখানে যাবার। আপনি দিনে ঝোল-ভাত পাবেন। রাত্রে রুটি-তরকারি। চা-টোস্ট বা মুড়ির ব্যবস্থা হ'য়েছে জলখাবারে। অন্ধকার থাকতে থাকতে খাওয়া দাওয়া সেরে খোলসে ঢুকে পড়তে হবে। এখন শীতকাল। কোন কষ্ট হবে না।'

"দিন কেটে যেতে লাগল।…দু'এক বার পাক খেয়েই সুকোমল খাঁচার কোণায় গিয়ে শুয়ে পড়ে সামনের দিকে পিছন ফিরে।

"ছুটির দিনগুলোয় কাজ বাড়ে। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা খোঁচাখুঁচি ক'রে শুতে দেয় না বেশীক্ষণ। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গিয়ে হাসি-মস্করা করে খাঁচার সামনে। কেউ ছবি তোলে

ক্যামেরা দিয়ে। মন্তব্য করে, 'বাঘটার তেমন তেজ নেই'। কেউ বলে, 'এই বাঘ জঙ্গলে থাকলে দেখতিস্। সে বারে বড় মামু সুন্দরবনে মহেশ চৌধুরীদের জমিদারীতে শিকার ক'রতে গিয়ে এমন এক কেঁদো বাঘের পাল্লায় পড়েছিলো...।' কান খাড়া ক'রে সুকোমল সে লোমহর্ষক গল্প শোনে।

"আরামের কাজই বলা যায়। ক্রমে ভালই লাগ্‌তে লাগল সুকোমলের। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মুখঝাম্‌টা নেই। গলা ফাটিয়ে চীৎকার কিংবা কলমবাজি করার দায় নেই। ভাবে, 'দি ওয়ার্ল্ড্ ইজ এ স্টেজ...'

'বহুৎ আচ্ছা'। চেয়ার টেনে কাছে এগিয়ে আসতে আসতে মিস্টার জবেরী বলে উঠলেন।

"এই ভাবে দিন কেটে চলেছে। পিসীকে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছে মাইনে পেয়েই। লিখেছে, 'কাজের চাপ বেশী। ছুটি নেই।'...পিসী সত্যনারায়ণকে শিন্নি দিয়ে গাঁয়ের লোককে বলেছে, 'সুকু আমার হাকিম হ'য়েছে।...তোমরা আশিব্বাদ কর, বাছা যেন বেঁচে-বর্ত্তে ভোগ করে'।

"এমনিতে সুকোমলের বেশ কাটে। নিশ্চিন্তে। আরামে। কিন্তু এক-একদিন যেন কি হয় তার। আত্ম-অবিশ্বাসের ভারে নুয়ে পড়ে সে।...তার স্বভাবে একটা বন্য-হতাশা বাসা বাঁধে। একটা মূক-মর্মবেদনা, একটা অজানা আশঙ্কার কালো মেঘ তার সমস্ত অন্তর-আকাশ ছেয়ে ফেলে।" কোটি সূর্যের আলোও যেন সে

অন্ধকার ঘোচাতে পারবে না।···ভয়ঙ্কর অথচ ক্লীব ক্রোধ, তিক্ততা ও অপরিসীম বিরক্তি তাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। মূর্তিমান নালিশের মতো সে দাঁড়ায় সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে। তার মনে হয়, সমাজের যে নিয়ম-শৃঙ্খলে সে আজ পশুতে পরিণত হ'য়েছে সে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও গলদ আছে, অন্যায় আছে, অবিচার আছে। তার অন্তর মথিত ক'রে প্রশ্ন জাগে, 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন ?'···

"একদিন সন্ধ্যায় হয়েছে কি বাইরের লোকজন সব চলে গেলে গেট বন্ধ হ'য়ে যাবার পর একটা অন্ধকার কোণায় গিয়ে বসেছে সুকোমল। ভাবছে খোলসটা ছেড়ে এবার স্নান সেরে নেবে। এমন সময় এক কাণ্ড।"

'কী হ'ল ?' সমস্বরে সকলে বলে উঠলাম।

"প্রাণ সংশয়।...পাশেই ছিল এক ভালুকের খাঁচা। উত্তর-মেরুর সাদা ভালুক। দু'টো খাঁচার মাঝামাঝি জায়গায় দরজাটা ঝাড়ুদার হয়ত অসাবধানে বন্ধ ক'রতে ভুলে গিয়েছিল সেদিন।...

"সুকোমল দেখল প্রকাণ্ড বড় ভালুকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আসল বাঘকেই নাজেহাল করে ভালুক আর সে তো নকল। দেখেই তো সুকোমলের গায়ে কালঘাম ছুটল।

"এখন উপায় ?...চীৎকার ক'রতে গিয়ে গলায় স্বর ফুটল না। সুকোমলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া ঈশপের গল্প।

ভালুক জীবিত প্রাণীর রক্তপান করে। মড়া ছোঁয় না।···যেই ভাবা সেই কাজ। নিঃশ্বাস চেপে চোখ কপালে তুলে মড়ার মতো পড়ে রইল সুকোমল।···চাকরি-জীবনে প্রথম অনুভব ক'রল লেখা-পড়ারও মূল্য আছে।

"ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ভালুকটা। থাবা দিয়ে সুকোমলকে একটা ঠেলা দিল। তারপর সুকোমলের কানের কাছে একটা গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে অতি ধীরে বল্‌ল, 'ভয় নেই বন্ধু। আমিও কোলকাতা য়ুনিভার্সিটির একজন গ্র্যাজুয়েট'।..."

ডাইনিং হল ফেটে পড়ল সমবেত অট্টহাস্যে। হাসির তোড় থামলে শ্রীমতী ওয়াদিয়া মোমসাহেবকে বল্লেন, "আপনি প্রাচীন Hypataতে Festival of Laughter day তে এই রকম গল্প বল্‌লে তারা আপনাকে প্রথম নাগরিকের সম্মান দিয়ে ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়িয়ে রাখতো আপনার।"

মোমসাহেব বিব্রতভাবে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্‌লেন, "হাসির গল্প হ'ল বুঝি? আমি কিন্তু বল্‌তে চেয়েছিলাম একটি করুণ গল্প।...অক্ষম লোক। তাই বলার দোষেই এমন হ'য়েছে।"

## ॥ সতরো ॥

আওরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা অনেকখানি পথ। আটষট্টি মাইল।

পরদিন সকালে স্নানাদি সেরে গাড়িতে ওঠা গেল। জিনিস-পত্রও সব সঙ্গে নেওয়া হ'ল। যদি রাত্রে না ফিরতে পারি, অথবা যদি অন্য পথে ফেরার সুযোগ হয়। ভালই ক'রেছিলাম। কারণ সেখানে আর ফিরে যেতে হয়নি। জলগাঁও হয়ে আমরা বোম্বাইয়ের পথে পাড়ি দিয়েছিলাম। অজন্তা থেকে ফর্দাপুর গ্রাম চার মাইল। সেখান থেকে জলগাঁও স্টেশন মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল। আর জলগাঁও থেকে বোম্বাই দু'শো তিরিশ মাইল।

প্রাচীন নগর প্রাকার পার হ'য়ে এগিয়ে চলেছি।...

পাথরের রাস্তা, কিন্তু ভাল নয়। পথের দুপাশে শুধু দিগন্তপ্রসারী মাঠ। ক্বচিৎ দূরে এক-আধটা গ্রামের আভাস। কাছাকাছি লোকালয় নেই। পথে মাথা কুটলে রক্ত পাওয়া যেতে পারে, এক ফোঁটা জল পাওয়া যাবে না।

ফেব্রুআরি মাস হলে কী হবে এর মধ্যেই রৌদ্রের তেজ বেশ বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখে জ্বালা ধরে।...রাস্তায় দু'বার গাড়ির টায়ার ফাটলো। এতটুকু ছায়া নেই, যেখানে আমরা দু'দণ্ড দাঁড়াই। যক্ষের মতো জলের কুঁজো আগ্‌লে রেখেছি।...

মুর্শিদকুলি খান্ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে দৌলতাবাদ, তেলিঙ্গানা, বেরার ও খান্দেশের দেওয়ান হ'য়ে এদেশে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থান এ অঞ্চলে স্বল্পস্থায়ী হ'লেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

আচার্য শ্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় ভীমসেন বারহন্‌পুরীর 'নুসখ্-ই-দিলখুসা' গ্রন্থের উপর ভিত্তি ক'রে লিখেছেন যে, মুর্শিদকুলি খানের কৃষি-ব্যবস্থায় ১৬৫৮ শতকের কাছাকাছি সময়ে আওরঙ্গাবাদের চতুঃসীমায় একখণ্ডও পতিত জমি ছিল না। এ-মাটিতে সোনা ফলত। অথচ আজ এমন এক টুকরো জমি চোখে পড়ল না, যেখানে কোনকালে আবাদ হ'য়েছে বলে মনে হয়। দেশে দারিদ্র্য মহামারী ও মাৎস্যন্যায় লেগেই আছে। তার উপর তেলেঙ্গানায় শুনলাম (এবং এক পুলিসের কর্তার মুখেই শুনলাম) যে, ঘোরকলিতে ছোটলোক চাষাগুলোর এত বাড় বেড়েছে যে, বেটনের দিন আর নেই। সঙ্গীনের খোঁচা আর বুলেট হজম ক'রছে, তবু বশ মানছে না। দেশ স্বাধীন হ'য়েছে। গভর্ণমেণ্ট যে এখন তাদেরই, মূর্খগুলো সে কথা বিশ্বাসই ক'রতে চায় না। মূক জনতা মুখর হ'য়ে উঠেছে।

মূর্খ বুভুক্ষু চাষীগুলোর আর দোষ কি? তাদের প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীই বিশ্বাস ক'রতে চান্‌নি যে দেশ প্রকৃত স্বাধীন হ'য়েছে। তিরোধানের পূর্বরাত্রে—২৯ জানুআরি ১৯৪৮—তিনি লিখেছিলেন,—

"India has still to attain social, moral and

economic independence in terms of its seven hundred thousand villages as distinguished from its cities and towns."

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর গোটা কয়েক শহরের আকাশচুম্বী প্রাসাদের কানাকড়ি মূল্যও মহাত্মাজীর কাছে ছিল না,—যদি ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি ভীত-সন্ত্রস্ত অর্ধনগ্ন নিরন্ন মানুষ জীবন্ত নর-কঙ্কাল হ'য়ে থাকে। যদি বিশীর্ণা মায়ের বুকে থাকে মৃত নীলকণ্ঠ শিশু। তিনি চেয়েছিলেন সর্বভয়মুক্ত প্রাণ-চঞ্চল শিক্ষিত মানুষ আর শোষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন স্বাবলম্বী গ্রাম।...

গোল টেবিল বৈঠকের সময় মহাত্মাজী লণ্ডনে গিয়েছিলেন। এক মহিলা তাঁর একখানি ছবি আঁকেন। মহাত্মাজী সেই ছবির নীচে সাক্ষর ক'রে লিখে দেন, 'I am also a creative artist. My canvas is India.'

সৌন্দর্যের উপাসক মহাত্মাজী জীবনে কোনদিন মিথ্যা বা কুশ্রীতার সঙ্গে আপস করেননি। মহান শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের অখণ্ড ভারতবর্ষকে। আর তার বিশাল পটভূমিকায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক নূতন সমাজ, নূতন সভ্যতা, নূতন সংস্কৃতি, নূতন মানুষ।...

...অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি।

এখন যে দেশের উপর দিয়ে আমরা চলেছি প্রাচীনকালে, আর্যাবর্তের প্রান্তসীমায় অবস্থিত, এই বিস্তৃত ভূভাগের নাম ছিল

বিদর্ভ দেশ। আনুমানিক ২৩৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রাজা বিদর্ভ এখানে রাজত্ব ক'রতেন। যাদব বংশেরই একজন বিখ্যাত রাজার নাম বিদর্ভ। তিনি অযোধ্যার রাজা সগরের সমসাময়িক। তাঁর কন্যা কেশিনীর সঙ্গে সগর রাজার বিবাহের কথা রামায়ণে পাওয়া যায়।

সূর্যবংশেরই ইক্ষ্বাকুকুলের যুবনাশ্বের পুত্র সম্রাট্ মান্ধাতা (২৭৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ ?) যাদব সম্রাট্ শেষবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ ক'রেছিলেন।

যেমন রোমের সীজার, জার্মানীর কাইজার, রাশিয়ার জার (শেষ দু'টি সীজার শব্দেরই অপভ্রংশ), জাপানের মিকাডো, ভারতবর্ষে মদ্র ও কেকয় রাজগণ অশ্বপতি, বিদেহ দেশের রাজারা জনক, দ্রাবিড়-পুলস্ত্য রাজগণ রাবণ উপাধি ব্যবহার ক'রতেন তেমনি বিদর্ভ দেশের রাজারা ভোজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

যাদব কুন্তী-ভোজের দত্তক কন্যা পৃথা জ্যেষ্ঠ তিন পাণ্ডব ও কর্ণের জননী এবং বসুদেবের সহোদরা।

প্রথম যৌবনের চাপল্যে কৌতূহলের বশবর্তিনী হ'য়ে অনূঢ়া পৃথা ঋষিপ্রদত্ত মন্ত্রের গুণে দিবাকরকে আহ্বান ক'রেছিলেন। দেবতা পূষা আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন মানবীর রূপে। অতনুতাপিত হ'য়ে প্রলুব্ধ ক'রেছিলেন অনভিজ্ঞা অসীমন্তিনী তরুণীকে।··· অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের প্রথম সন্তানকে সনাতন সমাজের ভয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বরবর্ণিনী কুন্তী চোখের জল মুছে দীর্ঘশ্বাসকে চেপে রেখেছিলেন। বহুকাল পরে হৃদয়ের মধ্যে সেই নির্বাসিত বন্দী-দীর্ঘশ্বাস তাঁকে তোলপাড় ক'রে তুলেছিল

হস্তিনাপুরের প্রাসাদ-অলিন্দে। কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্র-পরীক্ষার দিনে।…সহজাত কবচকুণ্ডলধারী আদিত্যবর্ণ প্রথম সন্তানকে সূতপুত্রের পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রতে দেখেও তিনি চিনতে পেরেছিলেন। কুসুমকোরকের ন্যায় সেই সদ্যোজাত শিশু আজ কার্মুকধারী শত্রুঞ্জয় বীর। তবু সে মুখ কি তিনি একদিনের জন্যও ভুলতে পেরেছিলেন?…তিনি মূর্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন এই সর্বনাশের কথা ভেবে যে যারা এক সঙ্গে থাকলে একে অপরকে সাহায্য ক'রে বড় হ'তে পারত তাঁর গর্ভজাত সেই সন্তানেরাই, মূলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, পরস্পরকে নিধনের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হবে।…

অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রাও বিদর্ভ রাজকন্যা।

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত এদেশের আর দুই রূপবতী রাজকন্যার কথা মনে পড়ছে। একজন এতই কোমলাঙ্গী ছিলেন যে, ফুলের ঘায়ে শুধু মূর্ছা'ই যান্‌নি, প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন।… অপরজন স্বয়ম্বর সভায় নয়নমনোহর দেবগণকে উপেক্ষা ক'রে হৃদয়মনোহর মানুষের গলায় বরমাল্য অর্পণ ক'রেছিলেন।

প্রথমা, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ রঘুর আত্মজ অজ রাজার মহিষী এবং দশরথের জননী ইন্দুমতী। দ্বিতীয়া হলেন ক্রথা বা [illegible]বথের কন্যা এবং নিষাদরাজ নলের সহধর্মিণী বিদুষী দময়ন্তী।

…বিদর্ভে ভোজ রাজত্বের অবসান হয় রাষ্ট্র-বিপ্লবে।…সে এখন -অধ্যায়ের ইতিহাস পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। আর্যাবর্তের নামে শেষ ভোজরাজ মদগর্বে এক ব্রাহ্মণ প্রজার কুমারী

কন্যাকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রমোদভবনে। তাতেই প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে। রাজ পরিবারের একজনকেও তারা জীবিত রাখেনি।—ভোজরাজের এই পরিণতি মিথিলার করাল জনকের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র।...

...দূরে দিকচক্রবালে বিন্ধ্যপর্বতের বিস্তীর্ণ নীল রেখা ক্রমেই স্পষ্টতর হ'চ্ছে। ওরই দক্ষিণের একাংশকে বলে অজন্তা ঘাট।

যে রাস্তার উপর দিয়ে ধূলো উড়িয়ে ছুটেছি, দাক্ষিণাত্যের এটি একটি সুপ্রাচীন পথ। এই পথের উপর দিয়ে বৈদিকযুগে আয-সংস্কৃতি বহন ক'রে সর্বপ্রথম বোধহয় এসেছিলেন ঋষি অগস্ত্য।

বৈদিকযুগে বিন্ধ্যপর্বতের এপারের ভূমি আর্যভাষীদের অনেকের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। অনার্যভাষীদের এই দেশকে তাঁরা দস্যু ও রাক্ষস অধ্যুষিত বলতেন। এটি ছিল তাঁদের নির্বাসন ভূমি। ব্রিটিশ আমলের আন্দামানের মতো। কাউকে নির্বাসন দিতে হ'লে আর্য নরপতিরা তাদের চালান দিতেন বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে। তারপর সে বেচারীরা হয় অনার্যভাষীদের হাতে প্রাণ দিত অথবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এদেশে বিয়ে থা ক'রে বসবাস ক'রত। প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলত। ক্রমে আর্যঋষিরা আশ্রম স্থাপন ক'রেছেন এ অঞ্চলে। ভাগ্যান্বেষী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এসেছেন। এইভাবে নর্মদা-কৃষ্ণা-কাবেরীর প্রবাহে

আর্যবারিধারা এসে মিশত। বাইরের পলিমাটি এসে সভ্যতার নূতন ফসল ফলাত। নবজীবন ও বৈচিত্র্য এনে দিত। নানা বিরুদ্ধ সুর মিশে সংস্কৃতির ঐক্যতান সৃষ্টি ক'রত।

সেই সুপ্রাচীনকালে ঋষি অগস্ত্য এই অঞ্চলে আশ্রম স্থাপন ক'রে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত ক'রেছিলেন। তিনি বোধকরি শান্তি ও প্রেমের পথে আর্য-সংস্কৃতি প্রচার ক'রেছিলেন।

বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিরা এবং বাকী বহু ব্রাহ্মণ ঋষিরা যখন নিজেদের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার ক'রতে যেতেন তখন তাঁদের পিছু পিছু যেতেন ধনুর্বান পিঠে নিয়ে ক্ষত্রিয় রাজারা।

"অগ্রতশ্চতুরো বেদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।"

তাঁরা মনে ক'রতেন, 'সমস্ত জ্ঞান আমাদের বেদে বিধৃত আছে। আমাদের সভ্যতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈদিক সংস্কৃতির বিজয় হওয়া চাই সর্ব জগতে। অক্ষয় স্বর্গ লাভের একমাত্র পথ আমাদেরই ধর্মে।'

ভাবখানা ছিল, 'হয় আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধীনতা স্বীকার ক'রে আমাদের ধর্ম নাও, নয় উচ্ছন্ন যাও।'···ঠিক যেমন মনে ক'রেছেন বিভিন্ন ধর্মের অন্ধ প্রচারকেরা। যার পরিচয় রয়েছে ক্রুসেড ও জিহাদে। যেমন মনে ক'রেছিলেন হিটলার। যেমন মনে ক'রেছেন মালান এবং ডি-কুন্‌হা।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র এই পথ দিয়ে জানকীর উদ্ধারের জন্য স্বর্ণলঙ্কায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অনুজ লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণকে

বাদ দিয়ে রামকে কল্পনা করা যায় না। দুই দেহ এক প্রাণ। যেন দীপ ও দীপশিখা।...

যুগের পর যুগ এই পথের উপর দিয়ে উন্মাদ কলরবে এসেছে বিজয়ী আর্যেরা, এসেছে সশস্ত্র শক-হুন, পাঠান আর মুঘল। অনলবর্ষী কামান নিয়ে এসেছে ইংরেজ। রক্তস্রোতে প্লাবিত হ'য়েছে এই পথ। বিজিতের ছিন্নমুণ্ড বর্শাফলকে গেঁথে এগিয়ে গেছে বিজয়ীর জয়রথ।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ক'রে মনে পড়ল সেই সব বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের যাঁরা ভগবান বুদ্ধ তথাগতের চিতাভস্মপূত অজন্তার বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। শুধু ভারতের নয়—চীন, জাপান, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, এশিয়া-মাইনর ও আরও কত দেশ থেকে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় ফা হিয়েন ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং য়ুয়ান চোয়াঙ্ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বহুমূল্য উপঢৌকন নিয়ে শ্রদ্ধাবনতহৃদয়ে অজন্তায় তীর্থ ক'রতে এসেছিলেন।

ভাবতে ভাল লাগ্‌ল, কোন্ সুদূর অতীতে—খ্রীষ্টজন্মের দু'শো বছর আগে থেকে—তীর্থকামীর যে অনন্ত শোভাযাত্রা এই পথের উপর শুরু হয়েছে আমরাও তার মধ্যে সকলের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছি। আমাদের পরেও কতদূর পর্যন্ত সে মিছিল বিস্তৃত কে জানে?...

* * *

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের মধ্যভাগের মধ্যে খনিত অজন্তার গুহাগুলি মাঝখানে কয়েক শতাব্দী লোকচক্ষুর

অন্তরালে আত্মগোপন ক'রেছিল। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে এখানের গভীর অরণ্যে শিকার ক'রতে বেরিয়ে এক গ্রাম্য রাখাল বালকের সাহায্যে এগুলি আবিষ্কার করেন একজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ। কিন্তু ১৮৪৯এর আগে এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি।

তবে অজন্তার কথা সভ্য সমাজের লোকের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এ বিষয়ে একটা কিংবদন্তী চলে এসেছে,—

বহুযুগ আগে দেব-দেবীরা স্বর্গের একঘেয়েমিতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলেন।...

হবার কথাই। শুধু অমৃত ফল, পারিজাত ফুল, সোমরস আর আদ্দিকালের উর্বশী-মেনকা-রম্ভা-মিশ্রকেশী-ঘৃতাচীর অবিরাম বৈচিত্র্যহীন নাচ কাঁহাতক রোজ রোজ ভাল লাগে? সে নাচে আবার তালভঙ্গ হবার জোটি নেই। পলকহীন চোখে তাই বসে বসে দেখতে হবে। সিনেমা নেই, ফুটবল নেই, ইন্‌কিলাব নেই। নারদ ঋষির কল্যাণে যা একটু পরচর্চার আস্বাদ পাওয়া যায়।

তাই দেবতারা একদিন মর্ত্যভূমিতে এসে কোথাও একরাত্রি আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্রের কাছে।

দেবরাজ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রলেন—কিন্তু এক সর্তে। ভোরবেলা, মোরগের প্রথম ডাকের আগেই, সকলকে স্বর্গে ফিরে আসতেই হবে। নাহলে স্বর্গের দ্বার তাঁদের জন্যে চিরতরে বন্ধ হ'য়ে যাবে।

সূর্যাস্তের পরই দেব-দেবীরা সকলে মর্ত্যলোকে নেমে এসে খুঁজতে খুঁজতে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি অজন্তা গিরিমালাটি সুন্দর ও নির্জন স্থান দেখে খুব পছন্দ ক'রলেন। তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ে কয়েকটি ঘর খোদাই ক'রে নৃত্যগীতবাদ্যে ও নানা আমোদপ্রমোদে কাটাতে লাগলেন।...

স্ফূর্তির ঝোঁকে সময়ের দিকে কারো খেয়াল রইল না। রাত্রির শেষ যাম উত্তীর্ণ হ'ল। হঠাৎ মোরগ ডেকে উঠতেই দেবরাজের অভিশাপে তাঁরা সকলে যে যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তি অথবা চিত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলেন চিরদিনের মতো।...

এই কল্প-কথায় একটা সত্য আছে। সেটা হ'চ্ছে, অজন্তায় সত্যই প্রতিমার ছদ্মবেশে দেবলোক নেমে এসেছে মর্ত্যলোকের বুকে।...

## ॥ আঠারো ॥

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা।

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবাস্তু নামে এক সমৃদ্ধ নগরীর রাজার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হ'ল লুম্বিনী উদ্যানে, এক শাল বৃক্ষের তলে।

শৈশবে মাতৃহারা এই ছেলেটি পালিত হ'ল বিমাতার কাছে। লালিত হ'ল ঐশ্বর্য-বিলাসে।

যৌবনে স্বয়ম্বর-সভায় এক সুন্দরী রাজকন্যা তাঁকে বরণ ক'রলেন। কালে তাঁর একটি সন্তান হ'ল।

রাজপুত্র দেখলেন ধর্মের নামে চারদিকে প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের শেষ নেই। সাধারণের দুর্বোধ্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের আর বিরাম নেই। সকাম যাগযজ্ঞের ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন। পশু-রুধিরে যজ্ঞভূমি কর্দমাক্ত। সেই রক্তকর্দম ধর্মের চক্রকে গ্রাস করে তার গতিরোধ ক'রেছে।

সত্যকে জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলল।…

উনত্রিশ বছর বয়সে এই রাজকুমার আত্ম-জিজ্ঞাসায় অধীর হ'য়ে সত্যের অন্বেষণে সংসার পরিত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রলেন।

ছ'বছর অক্লান্ত সাধনায় তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল। তিনি

অববোধ লাভ ক'রলেন। উপলব্ধি ক'রলেন অজ্ঞানতাই পাপ। সত্য ও অহিংসা সমস্ত সদ্‌গুণের নির্যাস। তৃষ্ণাক্ষয় ক'রতে পারলেই সর্ব দুঃখকে পরাভূত করা যায়।

তারপর ছিন্নকটিবাস ও ভিক্ষাপাত্র সম্বল এই রাজপুত্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে বৃহত্তর মহত্তর জীবনের পথ নির্দেশ ক'রেছেন।

তাঁর বাণী প্রচারিত হ'য়েছে দেশে দেশান্তরে। হাজার হাজার বছর ধ'রে সেই দীপ্ত জ্ঞান-বর্তিকা অনির্বান জ্বলছে।

এই রাজভিখারীর নাম সিদ্ধার্থ গৌতম, বুদ্ধ।

তিনি একাধারে জ্ঞান ও প্রেম। সংহত তেজ ও বিগলিত করুণা। অভ্রভেদী হিমালয় ও পুণ্যতোয়া জাহ্নবী। মৈত্রী ও করুণার জীবন্ত বিগ্রহ।

* * *

অহিংসা পরম ধর্ম—একথা গৌতম বুদ্ধই যে প্রথম উপলব্ধি করেন তা নয়। ভারতের চিত্তাকাশে নীহারিকা পুঞ্জের মতো অহিংসার বাষ্পীয় পদার্থ ছিল। উপনিষদের ঋষিদের আত্মজিজ্ঞাসায় তা স্পষ্টতর হয়েছে। কিন্তু তা প্রথম সার্থক রূপ গ্রহণ করে বুদ্ধের বাণীতে।

হিংসা আদিম প্রবৃত্তি। জড়জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, জীব জগতেও তেমনি হিংসার প্রতি আকর্ষণ। এই হিংসা রোধ করার চেষ্টা—অন্তত তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা—মানুষের আজকের নয়, অনেক দিনের। এ নিয়ে যুগে যুগে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা

হ'য়েছে। আজও হ'চ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। এই পরীক্ষাতেই সেদিন প্রাণ দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী।

সক্রেটিস্ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য ক'রে একবার বলেছিলেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে যতটুকু পরাজিত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছি, ততটুকুই আমি নৈতিক উৎকর্ষ লাভ ক'রতে পেরেছি'।

বাস্তবিক প্রকৃতি ও নীতি বিপরীতধর্মী। সমাজ-বন্ধন, সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয়-কেতন। প্রকৃতির মধ্যে পশুবুদ্ধিই প্রবল আর পশুবুদ্ধির সবচেয়ে উৎকট শক্তি হিংসাবৃত্তি। এই হিংসাবৃত্তি সংসারবন্ধন ও সামাজিক শুভ স্থাপনের পরিপন্থী। আত্মিক-বলে মানুষ যত বলীয়ান হ'য়েছে ততই অহিংসার বিকাশ হ'য়েছে।

অহিংসার বিকাশ হ'য়েছে ধীরে ধীরে। হিংসক মানুষের হাত থেকে কি ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে এজন্য অনেকে চিন্তা ক'রেছেন। অনেক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করা হ'য়েছে।

দেখা গেল ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষের জীবন নষ্ট করেন। ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হ'য়েছিল সমাজ রক্ষার জন্য। কিন্তু কালক্রমে রক্ষক হ'য়ে উঠলেন ভক্ষক। তখন হিংসা লোপ করার জন্য (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৫০—২৩৫০ মধ্যে) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে উদ্যোগী হ'লেন ভৃগু-বংশীয় এক ব্রাহ্মণ। জমদগ্নি ও রেণুকার কনিষ্ঠ পুত্র রাম। কুঠারকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য তিনি পরশুরাম নামে খ্যাত হ'য়েছিলেন। ক্ষত্রিয়দের হিংসার মূল কারণ মনে ক'রে তিনি ক্ষত্রিয়

ধ্বংস ক'রলেন। একবার দুবার নয়, একুশ বার। তিনি তবু সফলকাম হতে পারলেন না। কারণ "...for all they that take the sword shall perish with the sword". হিংসার পথে হিংসা রোধ করা যায় না। শুধু হিংসকেরই সংখ্যা বাড়ান যায়। হিংসারূপ বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ ক'রতে গিয়ে পরশুরাম হিংসারই বীজ বপন ক'রলেন।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে হিংসা ত্যাগ ক'রলেও আত্মরক্ষার জন্য হিংসকের শরণাপন্ন হতেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বোঝালেন, 'আপনাকে বেদ-ব্রাহ্মণ রক্ষা করার জন্য রাক্ষস বিনাশ ক'রতে হবে। এই আপনার কুলধর্ম।' ব্রাহ্মণেরা নিজেরা অস্ত্র ধারণ করেননি কিন্তু আশা পোষণ ক'রেছেন যে ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের রক্ষা ক'রবে। প্রতিশোধ নেবে। এই দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লেই তাঁদের অহিংসা পূর্ণতা লাভ করেনি।...

বুদ্ধদেবই প্রথম অহিংস আচরণকে সর্ব ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন এবং জনগণের মধ্যে তাদের নিজস্ব ভাষায় মৈত্রী ও করুণার অমৃতবাণী প্রচার ক'রলেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মাচরণের জন্য তিনি সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি অহিংসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ক'রেছিলেন। শুধু মানুষ নয়—সর্বজীবে অহিংসা। সর্বজীবে সমদৃষ্টি। সর্বজীবে প্রেমের সম্পর্ক।

প্রাচীনকালে মুনিঋষিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা ব্যক্তি-গতভাবে অহিংস আচরণ ক'রতেন। তাঁদের চরিত্রপ্রভাবে বাঘ ও হরিণ নাকি আশ্রমে একত্রে বিচরণ ক'রত। কিন্তু তাঁদের সে পৃথক

পৃথক ব্যষ্টিগত সাধনার সঙ্গে সমষ্টির যোগ ছিল না। সমাজে সম্মিলিতভাবে শুধু অহিংস আচরণ কেন ধর্মাচারণ বা আধ্যাত্ম-সাধনার কথা ব্রাহ্মণেরা ভেবে দেখেন নি। ভেবেছেন পরবর্তী-কালে ক্ষত্রিয়েরা।

বৈদিক যুগের পর ধর্মজগতে ব্রাহ্মণের দান আশ্চর্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ তাঁদের গোঁড়ামি ও যুগের সঙ্গে সমতা রেখে চলার অক্ষমতা। 'সমস্ত জ্ঞান বেদে বিধৃত আছে, বেদ-বহির্ভূত আর কিছুই থাকতে পারে না, হ'তে পারে না।' এই ধারণাই নূতন স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ ক'রেছিল।

উপনিষদের যুগেই দেখা যায়, ক্রিয়াকাণ্ডে বীতরাগ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয়েরা এবং অ-ব্রাহ্মণেরা উদ্যোগী হ'য়েছেন অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাধান্যও লাভ ক'রেছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ অধ্যায়ে বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনা এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, রথচালক রৈকব শূদ্ররাজা জনশ্রুতিকে উপদেশ দিচ্ছেন। ঐ একই উপনিষদে সত্যকাম ও জাবলার উপাখ্যানে বোঝা যায় বর্ণ ও গোত্রের চেয়ে সত্যাশ্রয়ী জারজ সন্তানও পরমজ্ঞানের অধিকারী। এই সত্যকাম রাজর্ষি জনকেরও শিক্ষাদাতা। ক্ষত্রিয় নরপতি প্রবাহন ব্রাহ্মণ গৌতমকে ও আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে জন্মান্তরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই কেকয় রাজ অশ্বপতিকে দেখা যায় পাঁচজন

ব্রাহ্মণ শিষ্যকে আত্মার অবিনশ্বরতা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ ক'রতে।··· ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনায় নারীও পিছিয়ে ছিলেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাচক্নের কন্যা গার্গী ও বাজসনির পুত্র যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনা এবং মৈত্রেয়ী ও সুলভার কাহিনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দ্বাপর যুগ থেকে নিয়ে কলিযুগের সেদিন পর্যন্ত ধর্মজগতে গুরুর আসন অধিকার ক'রেছেন, ধর্মপ্রচার ক'রেছেন ব্রাহ্মণেরা নয়,—ক্ষত্রিয় সন্তানেরা। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায়, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বর্ধমান মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ।...উপনিষদের যুগের সময় থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে সময়, তার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ধর্মপ্রচারের কাহিনী, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনার পরিচয়, অহিংসার জয়জয়াকার।

শঙ্করাচার্যের পরে ধর্মপ্রচার ক'রেছেন, চৈতন্য, বল্লভাচার্য, তুকারাম, নানক, নামদেব, কবীর, রুইদাস, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ।...এঁরা সমাজের নানা স্তরের লোক। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ কায়স্থ, কেউ মুচি, কেউ জোলা। এঁরা সকলেই অন্তরের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রেমকে উপজীব্য ক'রেছেন এবং অল্প-বিস্তর অহিংসার কথা বলেছেন। তাঁরা প্রচার ক'রেছেন সর্বজীবে প্রিয়জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, দেবতাজ্ঞান। যত্র জীব তত্র শিব।···

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হ'য়েছে।···ভিক্ষা থেকে কুটীরে ফিরলেন নামদেব। সঙ্গে এক মুঠো ভিক্ষালব্ধ বাজরার আটা। দাওয়ায় বসে দু'খানি রুটি তৈরি ক'রলেন। ইষ্ট দেবতাকে উৎসর্গ

ক'রে দিনান্তে প্রসাদ গ্রহণ ক'রবেন।···হঠাৎ মনে পড়ল ঘরে এক রত্তি ঘি আছে। রুটিতে মাখাবার জন্যে তাই আন্‌তে ঘরে ঢুক্‌লেন আর এক পথের কুকুর এসে তাঁর রুটি দু'খানি খেতে আরম্ভ ক'রে দিল।···ফিরে এসে ব্যাপার দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন নামদেব। বল্লেন, 'আজ তোমার এতই খিদে পেয়েছিল প্রভু যে শুক্‌নো রুটিতে ঘি মাখাবারও তর সইলো না ?'···

বর্তমান যুগ দেখেছে প্রেমের দীপ্য শিখা। সত্য ও অহিংসার দীপ্র মূর্তি।

এ যুগের ঋষি এক বেনের ছেলে। রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'The Great Soul in beggar's garb'. তাঁর মন্ত্র ক্রোধকে অক্রোধে জয় করার।...

অনেককাল আগে বিনায়ক দামোদরপন্থ সভারকর তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা গান্ধীজী, আপনি তো খুব জোরগলায় অহিংসার কথা প্রচার ক'রছেন। মনে করুন, যদি কোন বিষধর সাপ আপনাকে আক্রমণ করে এবং আপনার হাতে একটি লাঠি থাকে, আপনি আত্মরক্ষার জন্য কি ক'রবেন ?'

মহাত্মাজী হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'হাতের লাঠিটি আমি ছুড়ে ফেলে দেব, পাছে বিচলিত হ'য়ে সেটি সাপের বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রে বসি'।

## ॥ উনিশ ॥

দুর্গের মতো পাঁচিল-ঘেরা অজন্তা গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দূরে গিরিমালার পাদদেশে গিয়ে আমাদের গাড়ি থাম্‌ল।

আধুনিক কালে তৈরি প্রায় শ'দুই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হ'ল পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। তার পরেই চোখে পড়ল হাঁসুলির বাঁক। এক-তৃতীয়াংশ মাইলের কিছু বেশী, শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদের মতো পাহাড়ের গায়ে ২৯টি গুহা। পাহাড়ের ২৫০ ফীট উপরে আরম্ভ হ'য়েছে গুহাগুলি। নাগরাজের মূর্তির সামনে সাতটি ঝরণা ধারার জল জমে ছোট্ট একটি হ্রদ।···

সেই দিকে চেয়ে আছি মুগ্ধ হ'য়ে। এমন সময় দরাজ গলার সাদর অভ্যর্থনায় চমক ভাঙল।

'আইয়ে ভাই সাহব—'

এখানের কিউরেটর ডাকছেন। বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। মুসলমান এবং খাস লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান। বিদগ্ধ ও মধুরভাষী। নাম মুহম্মদ এ. ওয়াহিদ খান্‌।

ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিয়ে জোরাল আলোর ব্যবস্থা ক'রে তাঁর সঙ্গে আমরা প্রথম সংখ্যক গুহাটিতে প্রবেশ ক'রলাম।

গুহাগুলিতে নম্বর কালানুক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়নি। রাস্তায় যে ভাবে বাড়ির নম্বর দেওয়া হয়, সেইভাবে একের পর এক ১ থেকে ২৯ নম্বর দেওয়া হ'য়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত হাল আমলে।

প্রথম গুহা বা হর্ম্যটি মহাযানী বৌদ্ধদের একটি বিহার। এর সামনের বারান্দা ১২ × ৬৫ ফীট। ঘরটির আয়তন ৬৫ × ৬৫ ফীট। উঁচু ১৫ ফীট। ঘরে ২০টি থাম। ১৬ নম্বর বিহারটিরও মাপ এই একই। বাকী গুহাগুলিও সাধারণভাবে বলা যায় প্রায় এই মাপের।

এই এক নম্বর গুহাটিতেই অজন্তার শ্রেষ্ঠ ফ্রেস্কোগুলি র'য়েছে। এগুলি মোটামুটিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে অথবা চালুক্য রাজত্বের প্রথম দিকে অর্থাৎ সপ্তম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে চিত্রিত। এই হলঘরটির সবটাই আগে চিত্রে পরিপূর্ণ ছিল, থাম ও সিলিং পর্যন্ত। এখন অধিকাংশই নষ্ট হ'য়ে গেছে প্রাকৃতিক কারণে। মানুষও নষ্ট ক'রেছে অনেক। তবু এখনও যা অবশিষ্ট আছে, শ্রেষ্ঠত্বে তার সমকক্ষ পৃথিবীর আর কোন চিত্রশালায় মিলবে কিনা সন্দেহ।

প্রথম গুহায় দরজার সামনে সোজা এগিয়ে গিয়ে শেষপ্রান্তের কক্ষে চোখে পড়ল, এক রূপবান পাথর ধ্যানমগ্ন। 'যিনি পর্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান এবং যিনি তেজস্বী', সেই রাজ-ভিখারীর নিভূষণ পরম সুন্দর স্তব্ধ মূর্তি! 'বৃক্ষৈব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'।...যিনি জন্মকূটের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য জীবনপণ সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি সম্বুদ্ধ।

বাঁ দিকের দেওয়ালে দাসদাসী পরিবৃত, নীলপদ্ম হাতে মুকুট-পরা যুবরাজ গৌতমের ছবি। পাশেই যশোধরা। সম্ভবত তাঁদের

বিবাহের সময়ের দৃশ্য। গৌতমের চোখে যেন সংসারের আবিলতা ও অসারতা ধরা পড়ে গেছে। যশোধরার মুখে-চোখে পরিতৃপ্তি মাখান। সংসার-পাতার স্বপ্ন।···পাশেই দু'টি সারস পাখী। একটি উড়ে যাবার চেষ্টা ক'রছে, অপরটি আরাম ক'রে বাসায় বস্‌ছে। এই দম্পতির মনের বিপরীত ভাবের প্রতীক তারা।

কারো কারো মতে এই ছবিটি মহাকারুণিক পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের। তিনি জনপ্রিয় দেবতা বৌদ্ধসঙ্ঘে তাঁর আসন অতি উচ্চে। বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর সর্বপ্রধান। তাঁর কুল ও প্রতীকচিহ্ন পদ্ম। বর্তমান 'ভদ্রকল্পের' তিনি অধিদেবতা। ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই রক্ষাকর্তা।

এই গুহাতেই আর একটি ছবিতে দেখা যায়, বোধিদ্রুমের তলে ধ্যানাসনে বুদ্ধ বসে রয়েছেন এবং মার তার রূপসী কন্যাদের নিয়ে হাস্যে-লাস্যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা ক'রছে। মারের অনুচর নানা জীবজন্তু ও দৈত্য-দানারাও কাছাকাছি রয়েছে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষ থেকে মানুষের মনে ভাল ও মন্দের যে দ্বন্দ্ব চলে এসেছে সমস্ত ধর্ম-সাহিত্যেই তার রূপকাত্মক বর্ণনা দেখা যায়। বেদে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর, পুরাণে দেব ও দানব, রাম-রাবণ অথবা পাণ্ডব-কৌরব। জরথুস্ত্র ধর্মে অহুরমব্‌দ ও অহরিমান, খ্রীষ্টধর্মে প্রভু ও শয়তান। ইস্‌লাম ধর্মে অল্লাহ ও ইব্‌লিস। বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধ ও মার।

মার বুদ্ধের সাধনা ব্যর্থ করার চেষ্টা করতে থাকে। অবিচলিত

থেকে সে সময়ে মার-কন্যাগণকে উদ্দেশ্য ক'রে বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ ক'রেছিলেন,—

'যস্‌স জিতং নাবজীযতি
জিতমস্‌স নো যাতি কোচি লোকে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং
অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ ?…'

যাঁর লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতির জয়কে পরাজয় করা যায় না, যাঁর জয়ে কোন রকম কলঙ্ক প্রবেশ ক'রতে পারে না, সেই সর্বজ্ঞ অনন্তগোচর এবং জন্মান্তরের পথ যাঁর রুদ্ধ হ'য়েছে, সেই পথহীন বুদ্ধকে তোমরা কোন্ পথে কোথায় নিয়ে যাবে ?...

এই বিশাল অপূর্ব চিত্রখানি প্রায় নষ্ট হতে চলেছে অবহেলায় ও অযত্নে।

এই গুহাটির সিলিংয়ে বাতাপি বা বাদামীর চালুক্য-সম্রাট্ 'হর্ষবর্ধন-শিলাদিত্য-বিজয়ী' দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভায় সাসেনীয় বংশের গৌরব পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু প্রেরিত রাজদূতের ছবি রয়েছে। এ থেকে সে যুগে ভারত-পারস্যের মৈত্রীর কথা জানা যায়।

উনত্রিশটি গুহার মধ্যে ষোলটিতে অল্প-বিস্তর ছবি দেখা যেত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেও। বর্তমানে ১, ২, ৯, ১০, ১৬ এবং ১৭ মাত্র এই ছ'টি গুহাতে ছবি রয়েছে। বাকী সমস্তই কালের করাল দংশনে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

১৬ ও ১৭ সংখ্যক গুহায় ছবিগুলির মধ্যে কাহিনীর ধারা-

বাহ্যিকতা রয়েছে সব চেয়ে বেশী। Narrative style এর প্রাধান্য। পণ্ডিতেরা মনে করেন এ গুহা দু'টি বাকটক রাজত্বের সময়ে খনিত ও চিত্রিত হ'য়েছিল।

ষোল নম্বর গুহাটি ছবিতে ভরা। এখানে এক রাজকন্যার মৃত্যুর দৃশ্যটি নিপুণ তুলিকায় আঁকা। এই গুহা থেকে হ্যাম্পসটীডের ক্যাপ্টেন উইলিয়মস্ নামে এক ব্যক্তি ১৯২২ স'লে ১১½×৮½ ইঞ্চি মাপের একটি সাধারণ ছবি দেওয়ালের প্লাস্টার সুদ্ধ তুলে ইংল্যাণ্ডে নিযে যান এবং সেখানে নিলামে এক হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করেন। বর্তমানে সেই ছবিটি বোস্টন সহরের মিউজিয়মে আছে।

সতরো নম্বর গুহায় বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা আঁকা রয়েছে। এই ছবিগুলিতে আদর্শের চেয়ে নাটকীয়তা বেশী। মহাহংস জাতকের ছবিতে বর্ণ সুষমার পরিচয় সব চেয়ে সুন্দর। শিল্পী সমস্ত অন্তর দিয়ে এই কাহিনীকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন।...জাতকের মধ্যেই বোধকরি পৃথিবীর প্রাচীনতম রূপকথাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। জন্মান্তরবাদে ভরা এই দেশ-প্রচলিত গল্পগুলি পরবর্তীকালে বৌদ্ধেরা ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। পালি ভাষায় লেখা এই জাতক অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধ প্রায় পাঁচশ' তিরিশবার জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন।

একের পর এক গুহাভ্যন্তর ঘুরে আমরা উপনীত হলাম দশম সংখ্যক গুহায়। এটি হীনযান বৌদ্ধদের একটি চৈত্য এবং অজন্তার প্রাচীনতম গুহা। এটিকে নিয়েই শ্রমণেরা অজন্তায় কাজ শুরু

ক'রেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগে। এই গুহাটি ১০০ ফীট লম্বা, ৪০ ফীট চওড়া আর ৩৩ ফীট উঁচু। এটি একটু বেশী অন্ধকার। অর্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতমালার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এটির অবস্থিতি। গুহামুখে প্রাচীন ইন্দো-আর্য ভাষায় লেখা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, বসথিপুত্র নামে কোন রাজা বা শ্রেষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে এই গুহা খনিত হ'য়েছিল। সে যুগে ভূস্বামী বা শ্রেষ্ঠীরা আজকের দিনের জমিদার শেঠদের মতো slow horse and fast women এর পিছনে দেউলে হতেন না। তাঁরা জনহিতার্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রতে, মঠ-মন্দির-শিক্ষায়তন স্থাপন ক'রতে অকৃপণ হাতে অর্থ ও ভূমিদান ক'রতেন।

এই দশম সংখ্যক চৈত্যে বুদ্ধের কোন মূর্তি নেই। তবে ছদ্দন্ত জাতকের গল্প দেওয়ালে আঁকা রয়েছে। বুদ্ধ কোন এক জন্মে হাতি হ'য়ে জন্মেছিলেন, সেই কাহিনী।

অজন্তার চিত্রকলায় সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে নারীমূর্তী। জগতের কোন শিল্পেই নারীকে এত সম্মান দেওয়া হয়নি। এমন ভাবে পূজা করা হয়নি। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রমণেরা নারীকে নরকের দ্বার বলে দূরে রাখেন নি। সমস্ত প্রেরণার উৎস ও জীবনের সহচরী বলে প্রণতি জানিয়েছেন।···

মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। যেখানে নারী পূজিতা হন্ সেখানে দেবতারা বিরাজ করেন।

## ॥ কুড়ি ॥

অজন্তার শিল্প উপভোগ ক'রতে হ'লে ধর্ম শিল্প ও ইতিহাসের ত্রিনেত্র থাকা প্রয়োজন। আমাদের সে সাধনালব্ধ জ্ঞানচক্ষু নেই। তবে মোটামুটি কয়েকটা বিষয় এই চশমা-পরা সাধারণ দুটি চোখ এড়িয়ে যায় না।

প্রাচীন হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের স্থান ছিল না। মুনি-ঋষিরা বা বানপ্রস্থাবলম্বী লোকেরা ছিলেন প্রতিবাসী-ত্যাগী গৃহী মাত্র। সন্ন্যাস বৌদ্ধধর্মের অবদান।

শাক্যমুনির জীবদ্দশায় তিনি ভক্তগণের মধ্যে মহা মানবরূপে পূজিত হতেন। তিনি কঠোর সন্ন্যাসের প্রতি কাউকে উৎসাহ দিতেন না। আনুষ্ঠানিক পূজারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রবর্তিত অষ্টসূত্র বা অষ্টপথের দ্বার সন্ন্যাসী গৃহী সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৫ শতকে (মতান্তরে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে) বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বানের পর, তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্মের ও নির্বানের সম্যক অধিকারী হ'তে হ'লে সংসার ত্যাগ ক'রে অর্হতের কঠোর জীবন বেছে নিতে হবে, এই অনুশাসন প্রচারিত হ'ল। গৃহীদের জন্য সম্বোধি লাভের কোন উপায় রইল না। এই আদি বৌদ্ধধর্ম বা থেরবাদ পরবর্তীকালে হীনযান (নিকৃষ্ট বাহন) নামে অভিহিত হয়। এতে নাকি অর্হতেরা স্বার্থপরের মতো শুধু

নিজেদেরই নির্বান বা মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন—বিশ্ববাসীর কথা বিস্মৃত হ'য়ে। মহাযানীরা সকলের জন্যই ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে হীনযান অসম্পূর্ণ।

হীনযানীরা বুদ্ধের মূর্তি-পূজার বিরোধী। যেমন ইস্‌লাম ধর্ম বিরোধী পয়গম্বরের মূর্তি গড়ার। বুদ্ধের নির্বানের পর তাঁর আকৃতি দেবতা বা মানুষ কারোরই দৃষ্টিগোচর হবে না—ব্রহ্মজলসূত্তে বর্ণিত বুদ্ধের এই উক্তি তাঁরা মেনে চল্‌তেন। তাই তাঁরা বুদ্ধের পদনখকণা, পূতাস্থি বা ভস্মাবশেষ সম্বলিত স্তূপের পূজা ক'রতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা আরো কিছু এগিয়ে বুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন ক'রে তার পূজা আরম্ভ করেন। যেমন,—বোধিবৃক্ষের তলে শূন্য-সিংহাসন, জলচৌকি, রাজছত্র, ধর্মচক্র, কল্পতরুর ছায়ায় চরণচিহ্ন প্রভৃতি। ক্রমে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী অবলম্বন ক'রে হস্তী, মৃগ, পক্ষী পর্যন্ত তা এগিয়েছে। কিন্তু তাঁর মাননীয় আকৃতি? নৈব নৈব চ। ভারতীয় বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণ করা তাঁর প্রতি অসম্মানকর মনে ক'রতেন। সম্ভবত গ্রীক-বৌদ্ধেরা গান্ধার-শিল্পে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করা প্রথম প্রচলন করেন। মথুরা-শিল্প তারপরে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে বৈভার পর্বতে সপ্তপর্ণী গুহায় মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে বুদ্ধের বিশিষ্ট শিষ্যগণ 'প্রথম মহাসঙ্গীতি'তে মিলিত হন। সেখানে বুদ্ধ-বচন সংগ্রহ করা হয়। ভিক্ষু উপালি বিনয়-পিটক এবং মহাকাশ্যপ অভিধম্ম-পিটক আবৃত্তি করেন।

একশ' বছর পরে 'দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি' হয় বৈশালীতে।

এই এক শতাব্দীকাল মধ্যেই বৌদ্ধসঙ্ঘ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মূলত কোন প্রভেদ ছিল না এবং অনেকস্থলে নানা সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা একই বিহারে বাস ক'রতেন।

'তৃতীয় মহাসঙ্গীতি' হয় পাটলিপুত্রে। মোগ্‌গলির পুত্র তিষ্য সভাপতি ছিলেন এই ধর্ম-সম্মেলনে। এই সময়ই নানা বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা দিতে থাকে টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে।

আদি বৌদ্ধধর্ম বা হীনযান মতের প্রতিবাদ ও তার সংস্কার ক'রে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রগতিবাদী মহাযান মত প্রচারিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ-সম্রাট্ পরম সৌগত কনিস্কের সক্রিয় পৃষ্ঠ-পোষকতায়। কনিস্কের রাজ্যাভিষেক কাল আনুমানিক ১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ; ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ নয় এবং তিনি শকাব্দের প্রবর্তক নন্।

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য তিনি 'চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি' আহ্বান ক'রেছিলেন। এর অনতি-কাল পরেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম জন্মগ্রহণ ক'রে অচিরে জনসাধারণের মধ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মহাযানীরা নূতন ভাষ্য দিলেন শাক্যমুনির বাণীর। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক'-এ এই নূতন ধারার সাধন-প্রণালী বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে। তাঁরা নৈতিক জীবনের প্রতি জোর দিয়ে প্রচার ক'রলেন যে সাধনার দ্বারা গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই ত্রিরত্নের অধিকারী হ'তে পারবে। কিন্তু এঁদের হাতে বুদ্ধ আর মহাতপস্বী অতিমানব রইলেন না। কল্পিত হলেন

ত্রাণকর্তা ঈশ্বররূপে। তিনি হিন্দুদের ব্রহ্মার সমতুল্য। সৃষ্টির পূর্বেও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি থাকবেন। তিনি শাশ্বত। বুদ্ধের জীবনে পুরাণের ছোঁয়াচ লাগল। অবতারবাদ দেখা দিল। নাস্তিকতার পরিবর্তে আস্তিকতা মাথা তুল্‌ল। বুদ্ধকে ঘিরে নানা অলীক উপাখ্যান রচিত হ'ল। তাঁরা পঞ্চমণ্ডলের অধীশ্বর এবং এক এক কল্পকালের নিয়ামকরূপে পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের কল্পনা ক'রলেন। যথা বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। সময় সময় বজ্রসত্ত্ব নামে ষষ্ঠ ধ্যানিবুদ্ধের কল্পনা করা হয়। ইনি পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের পুরোহিতের আসন গ্রহণ করেন। এই পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের মধ্যে পশ্চিম মণ্ডলের দেবতা অমিতাভ বোধ করি সর্বপ্রাচীন কল্পনা। আবার পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের প্রতিভূস্বরূপ কল্পিত হলেন বোধিসত্ত্বগণ। বোধিচিত্ত কথাটি থেকে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। যিনি কর্মের দ্বারা বুদ্ধত্বের পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনিই বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের সংখ্যা অনন্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি ধ্যানিবুদ্ধের কুলজাত। বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হ'লেন অবলোকিতেশ্বর…মৈত্রী ও করুণার প্রতীক। তিনি অমিতাভের প্রতিভূ। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব হ'লেন ভাবী বুদ্ধ।

এই ভাবে প্রাচীন বৈদিক দেবতাদেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'তে লাগল বুদ্ধের নানা ভাবমূর্তির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

শাক্যমুনি উপনিষদের একেশ্বরবাদকে নিয়ে গিয়েছিলেন শূন্যবাদে। মহাযানীরা ঐশী শক্তি আরোপ ক'রে বুদ্ধের নানা তারা অথবা শক্তিদেবীর কল্পনায় তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুদের

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর হাটের মাঝখানে। জ্ঞানের খরতাপে জনসাধারণের ধর্মতৃষ্ণা মিটছে না দেখে তাঁরা এনে দিলেন ভক্তির বারিধারা।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর বিভিন্ন সাধন-প্রণালী গুহ্যসমাজতন্ত্র নামে প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বসুবন্ধুর ভ্রাতা ভিক্ষু অসঙ্গ এই তন্ত্রখানি রচনায় সাহায্য ক'রেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে মহাযান ধর্ম চরম রূপ লাভ করে। তারপর থেকে ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাবে এর মধ্যে গুরু-পুরোহিতের আধিপত্য ও আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা বাড়তে থাকে। শেষদিকে মহাযান ধর্মে তান্ত্রিকতা এবং জাগতিক অভিলাষ সিদ্ধির জন্য অভিচার দেখা দেয়। সাধারণের দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক প্রাধান্য লাভ করে। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিতে, হিন্দু-ধর্মের আওতায়, বহু মাথা ও হাত যোগ হ'তে থাকে। এই ধর্ম বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতিতে বিবর্তিত হ'য়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে এবং সেগুলিতে বহু কদাচার প্রবেশ করে।

অজন্তার শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই বিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট। পাহাড় কেটে প্রথমে উপাসনার জন্য চৈত্য এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা-ও বাসের জন্য বিহার। তারপর বুদ্ধের পূর্বজন্ম অঙ্কনের ছলে আরণ্য পশুপক্ষীর ছবি, বনস্পতির প্রতীক বোধিবৃক্ষের ছবি। ধর্মচক্র সূর্যের আকারে দীপ্তি পেতে লাগল স্তম্ভের উপর অথবা রূপায়িত হ'ল পদ্মফুলে। ক্রমে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বজ্র অলঙ্কারে

পরিণত হ'ল। আত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক বৈদিক 'দ্বা-সুপর্ণ' হংস-মিথুন হ'য়ে শোভা পেতে লাগল সঙ্ঘারামের দ্বারে। বৈদিক যূপ-কাষ্ঠে বাঁধা যজ্ঞের পশুগুলি বৌদ্ধস্তম্ভের উপর সার সার সিংহ হস্তী প্রভৃতি রূপে দেখা দিল। তারপর গোচর আর অগোচর এই দুই ডানায় ভর দেওয়া আর্যভাষীর সুন্দর মানস-কল্পনা অনার্যভাষীর শিল্প-সাধনার সাযুজ্যে বুদ্ধের প্রতিমা গড়ে চল্‌ল একের পর এক। বুদ্ধের মানুষী-মূর্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে শিল্পীরা তাঁদের মানস-মূর্তিকে রূপায়িত ক'রতে লাগলেন সামান্য রঙ্‌ আর তুলি, পাথর ও বাটালির সাহায্যে। এই সংসার বিরাগীদের আর যাই থাক রূপ-বৈরাগ্য, রস-বৈরাগ্য ছিল না। তাই এঁদের হাতেই ভারতশিল্প পূর্ণ যৌবন লাভ ক'রল।

অজন্তায় দশম ও নবম সংখ্যক গুহায় চৈত্য দু'টি এবং অষ্টম দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গুহায় বিহার তিনটি। এই পাঁচটি হীনযান শ্রমণেরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক মধ্যে নির্মাণ ক'রেছিলেন। এগুলি কেন্‌হেরি, কোণ্ডনা, ভাজা, বেদশা, পিঠলখোরা, কার্লে, নাসিক ও জুনার প্রভৃতি বৌদ্ধ গুহাগুলির সমসাময়িক।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নূতন কোন গুহা এখানে খনিত হয়নি। এটিকে অজন্তা শিল্পকার্যের বিশ্রামের সময় বলা যেতে পারে।

মহাযানীদের চব্বিশটি গুহা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি কাল ( ৪৫০—

৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ ) মধ্যে খনিত এবং ভাস্কর্যে ও চিত্রে সজ্জিত হ'য়েছিল। এগুলি একাধারে মঠ ও মন্দির। সে সময়ে এখানে অন্তত দু'শ ভিক্ষুশিল্পী ও আরও বহু রাজমজুর একসঙ্গে কাজ ক'রতেন বলে মনে হয়।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ৬৪২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে অজন্তার কাজ অকস্মাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়। কারণটা রাজনৈতিক তো বটেই, ধর্মনৈতিকও।

এই সময়ে বাতাপির চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয় এবং হিন্দু নরপতি পল্লভরাজ প্রথম নরসিংহবর্মণ মহামল্ল এই অঞ্চল জয় করে নেন।...অমরাবতীর একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার ঔরসে নাগ-রমণীর গর্ভে পল্লভরাজবংশের উৎপত্তি হ'য়েছিল।

অজন্তার যুগের শেষ দিকে তৈরি হ'য়েছিল এক থেকে পঞ্চম সংখ্যক গুহা পশ্চিমদিকে এবং পূর্বদিকে সাতাশ থেকে উনত্রিশ। শেষোক্ত গুহা তিনটি দেখলে মনে হয়, অতর্কিতে কাজে বাধা পেয়ে সকলে পালিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেনি। বোধ হয় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হিন্দু সৈন্যেরা বিজিত রাজ্যে সুরক্ষিত এই গুহাগুলিকে তাদের দুর্গে পরিণত ক'রেছিল। ধর্ম-নৈতিক কারণ হ'ল—এই সময়ে ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে সংঘর্ষ হয় তাকে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র বলা যায়।

অজন্তার অনুপম চিত্রকলার পরিচয় দিই হেন সাধ্য আমার নেই। কোনটি ছেড়ে কোনটির কথা বলব ?

সৌন্দর্যের প্রাণপ্রবাহ—রূপের মাধুরিমা বয়ে চলেছে। আমাদের চোখে সবই সমান সুন্দর লাগল।

কবীরের ভাষায় শুধু বল্‌তে পারি,…

"…সব মূরত বীচ অমূরত
মূরতকে বলিহারী।"

জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে আজকের মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে। প্রাচীন ধর্ম, প্রথা ও সংস্কারকে পুরাতন নির্মোকের মতো ফেলে ফেলে চলেছে সে। কিন্তু সুদূর অতীতের এই অজ্ঞাতনামা শিল্পীদের দান আজকের দিনেও অমর হয়ে বিরাজ ক'রছে রূপগ্রাহী মানুষের মনের মণিকোঠায়।…

* * *

বিকেলে অতিথিবৎসল ওয়াহিদ খান্ সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর 'গরীবখানায়' প্রচুর মিষ্টি ও বাদাম পেস্তা সহযোগে চা খেতে খেতে সামনে চমৎকার ডাকবাঙ্লোটির দিকে চেয়ে মোমসাহেব বল্লেন, "আজ আমরা এখানে থেকে যাই। কাল আবার ভাল ক'রে সব ছবিগুলি দেখা যাবে।"

আমি সোল্লাসে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন ক'রতে যাচ্ছিলাম…, ব্রাহ্মণী গম্ভীর গলায় বল্লেন,—

"না। ডবল এক্স্‌পোজার হ'য়ে যাবে মনের ফিল্মে।"